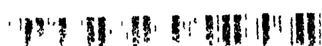
নীল তারা ইত্যাদি গল্প

পরশুরাম



এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিঃ
১৪. বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ

শ্রীসুপ্রিয় সরকার

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩

মূল্য ঃ তিন টাকা

মুদ্রক ঃ

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিঃ

১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড

কলিকাতা-১৩

সূচী

নীল তারা

ষাট বৎসর আগেকার কথা, কুইন ভিক্টোরিয়ার আমল। তখন কলকাতায় বিজলী বাতি মোটর গাড়ি রেডিও লাউড স্পীকার ছিল না, আকাশে এয়ারোপ্লেন উড়ত না, রবীন্দ্রনাথ প্রখ্যাত হন নি, লোকে হেমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ কবি বলত। কিন্তু রাখাল মাষ্টার মনে করত সে আরও উঁচু দরের কবি, হতাশের আক্ষেপের চাইতেও ভাল কবিতা লিখতে পারে। সে তার অনুগত ছাত্র নারানকে বলত, আজ কি একখানা লিখেছি শুনবি?—ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলি মাখে গায়। আর একটা শুনবি?—শুষ্ক বৃক্ষে ঝটিকার প্রভাব কোথায়। আর কেউ পারে এমন লিখতে?

রাখাল মুস্তৌফী শুধু এনট্রান্স পাস, কিন্তু বিদ্বান লোক, বিস্তর বাংলা ইংরেজী বই পড়েছিল। সেকালে বেশী পাস না করলেও মাষ্টারি করা চলত। কবিতা রচনা ছাড়া গান বাজনা আর দাবা খেলাতেও তার শখ ছিল। প্রথম বয়সে রাখাল বেহালা জুবিলি হাইস্কুলে থার্ড মাষ্টারি করত, তার পর দৈবক্রমে রূপ-চাঁদপুরের রাজাবাহাদুর রৌপ্যেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর সুনজরে পড়ে দু বৎসর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেছিল। কোনও কারণে সে চাকরি ছেড়ে তাকে চলে আসতে হয়। তার

পর দশ বৎসর কেটে গেছে, এখন রাখাল বেহালায় তার পৈতৃক বাড়িতেই থাকে এবং আবার জুবিলি স্কুলে মাষ্টারি করছে।

যখনকার কথা বলছি তখন রাখালের বয়স প্রায় তেত্রিশ। সুপুরুষ, কিন্তু চেহারার যত্ন নেয় না, উস্কখুস্ক চুল, দাড়ি কামায় না, তাতে একটু পাকও ধরেছে। পাড়ার লোকে বলে পাগলা মাষ্টার। সেকালে লোকে অল্প বয়সে বিবাহ করত, কিন্তু রাখাল এখনও অবিবাহিত। বাড়িতে সে একাই থাকে, তার মা দু বৎসর আগে মারা গেছেন।

রবিবার, সকাল আটটা। রাখাল তার বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় একটা তক্তপোশে বসে হুঁকো টানছে আর কবিতা লিখছে। বাড়ি থেকে প্রায় এক শ গজ দূরে একটা আধপাকা রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে। রাখাল দেখতে পেল, একটা ভাড়াটে ফিটন গাড়ি এসে থামল, তা থেকে দুজন সাহেব আর একজন বাঙালী নামল। গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল, আরোহীরা হনহন করে রাখালের বাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

সাহেবদের একজন লম্বা রোগা, গোঁফদাড়ি নেই, গাল একটু তোবড়া, সামনের চুল কমে যাওয়ায় কপাল প্রশস্ত দেখাচ্ছে। অন্য জন মাঝারি আকারের, দোহারা গড়ন, গোঁফ আছে, একটু খুঁড়িয়ে চলেন। তাঁদের বাঙালী সঙ্গীটি কালো, পাকাটে মজবুত গড়ন, চুল ছোট করে ছাঁটা, গোঁফের ডগা পাক দেওয়া, পরনে ধুতি আর সাদা ড্রিলের কোট। রাখাল হুঁকোটি রেখে অবাক হয়ে আগন্তুকদের দিকে চেয়ে রইল।

কাছে এসে লম্বা সাহেব হ্যাট খুলে বললেন, গুড মর্নিং সার। অন্য সাহেব হ্যাট না খুলেই বললেন, গুড মর্নিং বাবু। তাঁদের বাঙালী সংগী নীরবে রইলেন।

রাখাল সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করে বলল, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং সার। ভেরি সরি, আমার বাড়িতে চেয়ার নেই, দয়া করে এই তক্তপোশে—এই উড্‌ন প্ল্যাটফর্মে বসুন।

লম্বা বললেন, দ্যাট্‌স অল রাইট, আমরা বসছি, আপনিও বসুন। মিস্টার রাখাল মুস্তৌফীর সংগেই কি কথা বলছি?

—আজ্ঞে হাঁ।

দুই সাহেব নিজের নিজের কার্ড রাখালকে দিয়ে তক্তপোশে বসলেন, রাখালও বসল। আগন্তুক বাঙালী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন, সাহেবের সংগে একাসনে বসতে তিনি পারেন না।

গুঁফো সাহেব মুখের সিগারেট ফেলে দিয়ে বললেন, এই বেংগলী বাবু হচ্ছেন আমাদের দোভাষী বাঞ্ছারাম খাঞ্জা। বোধ হয় এঁর দরকার হবে না, আপনি ইংরেজী জানেন দেখছি, আমরা সরাসরি আলাপ করতে পারব। ওয়েল মুস্তৌফী বাবু, আমার এই ফেমস ফ্রেণ্ডের নাম আপনি শুনেছেন বোধ হয়?

কার্ড দুটো ভাল করে পড়ে রাখাল বলল, আজ্ঞে শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না, ভেরি সরি।

—কি আশ্চর্য, আপনি তো একজন শিক্ষিত লোক, স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে এঁর কথা পড়েন নি?

—পুওর ম্যান সার, স্ট্রান্ড ম্যাগাজিন কোথা পাব? শুধু বঙ্গবাসী জন্মভূমি আর মাঝে মাঝে হিন্দু পেট্রিয়ট পড়ি।

—ইংরেজী গল্পের বই পড়েন না?

—তা অনেক পড়েছি, স্কট ডিকেন্স লীটন জর্জ ইলিয়ট আমার পড়া আছে।

—ক্রাইম স্টোরিজ পড়েন না?

—রেনল্ড্‌সের বিস্তর নভেল পড়েছি, মায় মিস্ট্রিজ অভ দি কোর্ট অভ লণ্ডন।

—ফর শেম মুস্তৌফী বাবু! ওর বই ছুঁতে নেই, দেশদ্রোহী বজ্জাত লোক।

—তিনি কি করেছেন সার?

—সে লিখেছে, ফ্রেঞ্চ জাতি সবচেয়ে সভ্য, নেপোলিয়নের মতন গ্রেট ম্যান জন্মায় নি, আর ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এতই অপদার্থ যে যত সব জার্মন বদমাশ ধরে এনে আমাদের রাজকুমারীদের সঙ্গে বিয়ে দেয়। যাক সে কথা। তা হলে আমার এই বিখ্যাত বন্ধু সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না?

রাখাল একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, শুধু এইটুকু জানি, ইনি এই প্রথম এদেশে এসেছেন, কিন্তু আপনি নতুন আসেন নি।

লম্বা সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, দ্যাট্‌স ফাইন! আর কি জানেন মিস্টার মুস্তৌফী?

—কাল রাত্রে আপনাদের ভাল ঘুম হয় নি।

—ভেরি ভেরি গুড! আর কি জানেন?

—আপনারা কাল লংকা খেয়েছিলেন।

—লংকা? ইউ মীন সীলোন, আইল্যান্ড অভ রাবণ?

—আজ্ঞে সে লংকা নয়। হিন্দী নাম মিরচাই, ইংরেজী নামটা মনে আসছে না। রেড অ্যান্ড গ্রীন পড—হাঁ হাঁ মনে পড়েছে, চিলি, রেড পেপার, ক্যাপ্‌সিকম, ভেরি হট স্পাইস।

লম্বা সাহেব তাঁর বন্ধুকে বললেন, ওহে ওআটসন, দেখছ তো, সায়েন্স অভ ডিডক্‌শন এই বেঙ্গলী জেন্টলম্যান ভালই জানেন। নাঃ, এদেশে শারলক হোম্‌সের পসার হবে না।

ওআটসন বললেন, মুস্তোফী বাবু আপনি কি ইয়োগা প্র্যাকটিস করেন?

রাখাল বলল, যোগশাস্ত্র? না, তা আমার জানা নেই। আমার বাবা কবিরাজি করতেন—ইণ্ডিয়ান সিস্টেম অভ মেডিসিন, তাঁর কাছ থেকে আমি কিছু শিখেছি। সমস্ত লক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে কারণ অনুমান করা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ওআটসন প্রশ্ন করলেন, কাল রাত্রে আমাদের ভাল ঘুম হয় নি তা বুঝলেন কি করে?

শারলক হোম্‌স বললেন, এলিমেণ্টারি ওআটসন, অতি সহজ। আমাদের মুখে মশার কামড়ের দাগ রয়েছে। আমরা মশারির মধ্যে শুই নি, পাংখাপুলারও মাঝরাত্রে পালিয়েছিল। কিন্তু আর দুটো বিষয় টের পেলেন কি করে?

রাখাল বলল, খুব সহজে। আপনি এসেই টুপি খুলে আমাকে 'সার' বললেন। অভিজ্ঞ সাহেবরা সামান্য নেটিভকে

এত খাতির করে না। এতে বুঝলাম আপনি এই প্রথমবার বিলাত থেকে এসেছেন। ডক্টর ওআটসন টুপি খোলেন নি, আমাকে 'বাবু' বললেন, তাতে বুঝলাম ইনি পাক্কা সাহেব, নতুন আসেন নি, এদেশের দস্তুর জানেন।

—লংকা খাওয়া জানলেন কি করে?

—আপনার আঙুলে তামাকের রং ধরেছে, দেখেই বোঝা যায় আপনি খুব সিগারেট সিগার বা পাইপ টানেন। ডক্টর ওআটসনের মুখে সিগারেট ছিল, কিন্তু আপনার ছিল না। আপনি মাঝে মাঝে জিবের ডগা বার করছিলেন, অর্থাৎ জিব জ্বালা করছে। অনভ্যস্ত লোকে লংকা খেলে এইরকম হয়, সিগারেট টানতে পারে না। ডক্টর ওআটসন পাকা লোক, লংকায় ওঁর কিছু হয় নি।

হোম্‌স হেসে বললেন, চমৎকার! এই ওআটসনের কথা শুনেই কাল রাত্রে হোটেলে মাল্লিগাটানি সূপ, চিকেন কারি, আর বেঙ্গল ক্লাব চাটনি খেয়েছিলাম, তিনটেই প্রচণ্ড ঝাল। আচ্ছা, আমাদের সঙ্গী এই মিস্টার খাপ্পা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?

বাপ্পারামকে নিরীক্ষণ করে রাখাল বলল, ইনি তো পুলিসের লোক, চুলের ছাঁট, গোঁফের তা, আর ড্রিলের কোট দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া থুতনির নীচে টুপির ফিতের দাগ রয়েছে।

বাপ্পারাম খাপ্পা মাতৃভাষায় বললেন, হঃ, তুমি খুব চালাক লোক বট হে। আর ভি কিছু শুনাও তো দেখি?

—পঞ্চকোটে বাড়ি। সম্প্রতি খুব মার খেয়েছিলেন, কাঁধে আর হাতে লাঠির চোট লেগেছিল। তার জড়ানো মির্জাপুরী লাঠি, তার ছাপ এখনও চামড়ার ওপর রয়েছে।

—আমার গায়ের দাগটাই দেখলে হে? শালা বলদেও পানওয়ালাকে কি পিটান পিটাঁইছি তার খবর রাখ মাষ্টর?

হোম্‌স বললেন, মুস্তৌফী, আওআর ফ্রেণ্ড খাঞ্জার মুখ দেখে বুঝেছি এঁর সম্বন্ধেও আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, আপনি ও কি টোবাকো খাচ্ছিলেন? ভার্জিনিয়া টার্কিশ ম্যানিলা জাভা কিউবা কইম্বাটুর প্রভৃতি তেষট্টি রকম টোবাকো আমি ধোঁয়া শুঁখেই চিনতে পারি, কিন্তু আপনারটা বুঝতে পারছি না। স্মেল্‌স গুড।

—এর নাম দা-কাটা তামাক, খুব সস্তা আর কড়া।

—ড্যাকোটা? আমি যে শ্যাগ খাই তার চাইতে ভাল গন্ধ। কোথা পাওয়া যায়? আমি কিছু নিয়ে যেতে চাই।

—আমিই আপনাকে দু-তিন সের দিতে পারি, আমার বাড়ির তৈরি। কিন্তু পাইপে খাওয়া চলবে না, এইরকম হাবুলবাবুল চাই, হুক্কা কিংবা গড়গড়া। তার কায়দা আপনাকে শিখতে হবে। বিউটিফুল সায়েণ্টিফিক ইনভেনশন সার, জলের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া রিফাইণ্ড হয়ে আসে, জিব জ্বালা করে না।

—আপনার কাছ থেকে শিখে নেব। আচ্ছা, এখন কাজের কথা হ'ক। আমাদের আসার উদ্দেশ্য বোধ হয় বুঝেছেন?

—আপনারাও পুলিসের লোক?

—না, আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তবে দরকার হলে পুলিসকে সাহায্য করি বটে। আর আমার বন্ধু এই ডক্টর ওআটসন আমার সহকর্মী।

—রূপচাঁদপুরের কুমার স্বর্ণেন্দ্রনারায়ণ আপনাকে পাঠিয়েছেন তো? আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কিছু জানি না, আমার কাছে কোনও খবর পাবেন না।

হোম্‌স বললেন, মিস্টার খাঞ্জা, আপনার সাহায্য দরকার হবে না, আপনি ওই গাড়িতে গিয়ে বসুন।

বাঙ্খারাম চোখ পাকিয়ে রাখালকে বললেন, ও মশয়, বেশী ফড়ফড় ক'রো না, তোমাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, সাহেবদের কাছে যা জবানবন্দি করবে তাতে তুমিই ফাঁদে পড়বে।

বাঙ্খারাম চলে গেলে হোম্‌স বললেন, মুস্তৌফী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার চেষ্টার ফলে আপনার ভালই হবে।

রাখাল বলল, কুমার বাহাদুর আপনার মারফত আমাকে ঘুষ দিয়ে সন্ধান নিতে চান নাকি?

—তিনি ভাল মন্দ যে কোনও উপায়ে কার্যসিদ্ধি করতে চান, কিন্তু আমার পলিসি তা নয়। তাঁর স্বার্থ আর আপনার মঙ্গল দুইই আমি সাধন করতে চাই। আমি জানি, আপনি একজন সরলস্বভাব শিক্ষিত সৎলোক, আপনার উপর অনেক পীড়ন হয়েছে। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনাকে কিছুই বলতে হবে না, এদেশে আসবার আগে আমি যা শুনেছি এবং

এখানে এসে অনুসন্ধান করে যা জেনেছি, সবই আমি বলে যাচ্ছি, যদি কোথাও ভুল হয়, আপনি জানাবেন।

—বেশ, আপনি বলে যান।

শার্লক হোম্‌স বলতে লাগলেন।—রূপচাঁদপুরের কুমারের এজেন্ট মিস্টার গ্রিফিথ লণ্ডনে মাস খানিক আগে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বললেন, লেট রাজা রোপেণ্ডর—

রাখাল বলল, রৌপ্যেন্দ্রনারায়ণ।

—হাঁ হাঁ। ওই চোয়াল ভাঙা নামটা উচ্চারণ করা শক্ত, আমি শুধু রাজা বলব। গ্রিফিথ আমাকে যা জানিয়েছিলেন তা এই। —এক বৎসর হল রাজা মারা গেছেন। দ্যাট ওল্ডম্যান এক স্ত্রী থাকতেই আর একটি ইয়ং গার্ল বিবাহ করেছিলেন। নূতন রানীকে খুশী করবার জন্য তিনি তাঁকে বিস্তর অলংকার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে সব চেয়ে দামী হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড স্টার স্যাফায়ারের ব্রোচ।

রাখাল বলল, তার নাম নীল তারা, ব্লু স্টার। অতি মহামূল্য রত্ন, যার কাছে থাকে তার অশেষ মঙ্গল হয়। রাজার এক পূর্বপুরুষ দু শ বৎসর আগে এক পোর্তুগীজ বোম্বেটের কাছ থেকে কিনেছিলেন। ও রত্নটি নাকি সীলোনের কোনও মন্দির থেকে লুট হয়েছিল।

—দ্যাট্‌স রাইট। আপনি সে রত্ন দেখেছেন?

—না, শুধু বর্ণনা শুনেছি। তার পর?

—দ্বিতীয় বিবাহের কয়েক মাস পরেই পড়ে গিয়ে রাজার পা আর কোমরের হাড় ভেঙে যায়, প্রায় আট বৎসর শয্যাশায়ী থেকে তিনি মারা যান। তার পর হঠাৎ একদিন নূতন রানী নিরুদ্দেশ হলেন। রাজার যিনি উত্তরাধিকারী—কুমার বাহাদুর, বিস্তর খোঁজ করেছেন, কিন্তু নীল তারা পান নি, পলাতক রানীরও কোনও খবর পান নি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—রানী ফিরে আসুন, তিনি সসম্মানে রাজবাড়িতে নিজের মহলে থাকবেন, প্রচুর বৃত্তিও পাবেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় নি, এদেশের পুলিসও কোনও সন্ধান পায় নি। ঠিক হচ্ছে মুস্তৌফী?

— ওই রকম শুনেছি বটে। কিন্তু রাজার বিবাহের ব্যাপারটা আরও জটিল।

—তা আমি জানি, সব রহস্যের আমি সমাধান করেছি। তার পর শুনুন। কুমার বাহাদুর তাঁর বিমাতার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নন, তিনি শুধু রত্নটি উদ্ধার করতে চান। নীল তারা নূতন রানীর হাতে যাওয়ার কিছুকাল পরেই ওল্ড রাজা জখম হলেন, অনেক বৎসর কষ্টভোগ করে মারা গেলেন। তার পর নূতন রানী নিরুদ্দেশ হলেন। এস্টেটে নানারকম অমঙ্গল ঘটছে, ফসল হয় নি, খাজনা আদায় হচ্ছে না, তিনটে বড় বড় মকদ্দমায় হার হয়েছে, প্রজারা দাঙ্গা করছে, কুমার ডিসপেপসিয়ায়

ভুগছেন। তাঁর বিশ্বাস, সবই নীল তারার অন্তর্ধানের ফল।

—আপনি তা মনে করেন না?

—না। নীল তারা যতই দামী হক, একটা পাথর মাত্র, অ্যালুমিনার পিণ্ড, তার শুভাশুভ কোনও প্রভাবই থাকতে পারে না। আমাদের দেশেও রত্ন সম্বন্ধে অন্ধ সংস্কার আছে। কুমারের লণ্ডন এজেণ্ট গ্রিফিথ আমাকে বলেছিলেন, নীল তারা ছোট রানীর ডাউরি বা স্ত্রীধন নয়, ও হল রাজবংশের সম্পত্তি, এয়ারলুম, পাগড়িতে পরবার অলংকার। যিনি রাজা হবেন তিনিই এর অধিকারী। কুমার বাহাদুর শীঘ্র রাজা খেতাব পাবেন, সেজন্য নীল তারা তাঁরই প্রাপ্য। ছোট রানী তা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছেন।

রাখাল বলল, মিছে কথা। সমস্ত সম্পত্তি নিজের ইচ্ছামত দান বিক্রয়ের অধিকার বৃদ্ধ রাজার ছিল, তিনি ছোট রানীকে যা দিয়েছেন, তা স্ত্রীধন।

—আমি এখানকার অ্যাডভোকেট-জেনারেলের মত নিয়েছি। তিনিও মনে করেন স্ত্রীধন, তবে শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে আর প্রিভিকাউনসিলের বিচারে কি দাঁড়াবে বলা যায় না। যাই হক, নীল তারা উদ্ধারের জন্য কুমার বাহাদুর আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

—কুমার আমার কাছেও লোক পাঠিয়েছিলেন, ভয়ও দেখিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস আমি ছোট রানীর সন্ধান জানি। আপনি এদেশে এসে কিছু জানতে পেরেছেন?

—আমি এসেই রূপচাঁদপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমাদের লেট ল্যামেণ্টেড রাজা বাহাদুর একটি স্কাউনড্রেল ছিলেন, যেমন লম্পট তেমনি নেশাখোর, আর ঘোর অত্যাচারী। দশ বৎসর আগে তাঁর এস্টেটে রামকালী রায় নামে একজন কাজ করতেন। তাঁর সন্তান ছিল না, সাবিত্রী নামে একটি অনাথা ভাগনীকে পালন করতেন। মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী, তখন তার বয়স আন্দাজ ষোল। রূপচাঁদপুরেরই একটি ভাল পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েছিল। পাত্র আর পাত্রীর পরিবারের মধ্যে একটা দূর সম্পর্ক ছিল, কাছাকাছি বাসের ফলে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। পাত্রের কাছে পাত্রী লেখাপড়া শিখত। বিবাহের কথা হচ্ছে জেনে রাজা মেয়ের মামা রাম-কালীকে বললেন, খবরদার, অন্য কোথাও চেষ্টা করবে না, আমিই তোমার ভাগনীকে বিবাহ করব। মামা সাহসী লোক, রাজার কথা শুনলেন না, যার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল তার সঙ্গেই বিবাহের আয়োজন করলেন। বরপক্ষ কন্যাপক্ষ উপস্থিত, কন্যার মামা সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত, পুরোহিত মন্ত্রপাঠের উপক্রম করছেন, এমন সময় রাজা সদলবলে উপস্থিত হলেন। কেউ কোনও বাধা দিতে সাহস করল না, কারণ রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপ, আর তাঁর সঙ্গে পুলিসের দারোগাও শান্তিরক্ষা করতে এসেছিল। রাজার অনুচরেরা মেয়ের মামা আর বরের হাত পা বেঁধে তাদের সরিয়ে ফেলল, বরপক্ষ কন্যাপক্ষ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হল। তখন রাজা বরের আসনে বসলেন, তাঁর নিজের পুরোহিত মন্ত্র পড়ল, রাজার

এক মোসাহেব কন্যার খুড়ো সেজে অচৈতন্য সাবিত্রীকে সম্প্রদান করল। বিবাহের পর রাজা তাঁর নূতন পত্নীকে রাজবাড়িতে নিয়ে গেলেন। মামা দেশত্যাগী হলেন, আর পাত্রটি তার মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল।

—সেই পাত্রের পরিচয় আপনি জানেন?

—তার সঙ্গেই কথা বলছি। নাম রাখাল মুস্তৌফী, স্কুল মাস্টার, নিজেকে খুব বড় কবি মনে করে, যদিও তার একটা কবিতাও এ পর্যন্ত ছাপা হয় নি।

—নিজেকে বড় মনে করা কি দোষের?

—বোকা লোকের পক্ষে দোষের, তোমার আর আমার মতন বুদ্ধিমানের পক্ষে দোষের নয়।

—তার পর বলে যান।

—নূতন রানী সাবিত্রী বহুদিন পীড়িত ছিলেন। তাঁকে খুশী করে বশে আনবার জন্য রাজা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, বিস্তর অলংকার মায় নীল তারা দিয়েছিলেন, বাসের জন্য আলাদা মহল আর অনেক দাসদাসীও দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার জন্য মিশন স্কুলের সিস্টার থিওডোরাকে বাহাল করেছিলেন। কিন্তু বিবাহের পাঁচ মাস পরেই রাজা মাতাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে জখম হয়ে শয্যা নিলেন। নূতন রানী তাঁর টীচারের সঙ্গেই সময় কাটাতে লাগলেন।

—সাবিত্রী এখন কোথায় আছে তাই বলুন।

—ব্যস্ত হয়ো না, সব কথা একে একে বলছি। রাজার

মৃত্যুর পর নূতন রানীর উপর কড়া পাহারা বসল। তিনি খুব বুদ্ধিমতী, সিস্টার থিওডোরার সঙ্গে পরামর্শ করে পালাবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন দুপুর রাত্রে চুপি চুপি রাজবাড়ি ত্যাগ করলেন, সঙ্গে নিলেন কিছু টাকা আর অলংকার এবং একজন বিশ্বস্ত দাসী। নীল তারা নিয়ে যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু থিওডোরার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাও নিলেন। তার পর কলকাতায় এসে মিস সিসিলিয়া ব্যানার্জি নামে এক বাঙালী খ্রীষ্টান মহিলার বাড়িতে উঠলেন। থিওডোরাই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

—সাবিত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

—হয়েছে। রানী বললেন, আমি রাজবাড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়েছি, এখানে এক মেয়ে স্কুলে চাকরিও যোগাড় করেছি। নীল তারা আমি রাখতে চাই না, আপনি নিয়ে যান, কুমারকে দেবেন। আমি বললাম, বিনামূল্যে দেবেন কেন, আপনার আর মুস্তৌফীর উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার খেসারত আদায় করে তবে দেবেন। রানী বললেন, আমার কিছু স্থির করবার শক্তি নেই, মামা মামীও বেঁচে নেই যে তাঁদের উপদেশ নেব। আপনি মুস্তৌফীর সঙ্গে কথা বলবেন, তিনি যা বলবেন তাই হবে। মুস্তৌফী, তোমার উপর তাঁর খুব শ্রদ্ধা আছে, গ্রেট রিগার্ড।

—তিনি কি খ্রীষ্টান হয়েছেন?

—সিস্টার থিওডোরা তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু

রানী মোটেই রাজী হন নি।

—রানী বলবেন না, বলুন সাবিত্রী দেবী।

—ভেরি ওয়েল, সাবিত্রী দেবী, দি গডেস সাবিত্রী। দেখ ওআটসন, প্রেমে পড়লে নজর খুব উঁচু হয়, মনের ম্যাগনিফাইং পাওআর বেড়ে যায়। তোমার বিবাহের আগেও এই রকম দেখেছিলাম।

হোম্‌স তাঁর পকেট থেকে একটি বাক্স বার করে খুলে দেখালেন—সোনার ফ্রেমে বসানো নীল তারা, সুপারির মতন গড়ন, কিন্তু আরও বড়, ফিকে ঘোলাটে নীল রং, ভিতরে উজ্জ্বল তারার মতন একটি চিহ্ন, তা থেকে ছ দিকে ছটি রশ্মি বেরিয়েছে।

হোম্‌স বললেন, বহু কোটি বৎসর পূর্বে ভূগর্ভে তরল উত্তপ্ত অ্যালুমিনা ধীরে ধীরে জমে গিয়ে এই রত্ন উৎপন্ন হয়েছিল। এর বাজার দর খুব বেশী হবে না, বড় জোর দশ হাজার টাকা। কিন্তু কুমার যখন এর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন আর ফিরে পাবার জন্য লালায়িত হয়েছেন তখন তাঁকে চড়া দাম দিতে হবে। মুস্তৌফী, বল কত টাকা আদায় করব?

রাখাল বলল, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, যা স্থির করবার আপনিই করুন।

—কবিদের বিষয়বুদ্ধি বড় কম, অবশ্য অনারেবল এক্সেপ্‌শন আছে, যেমন লর্ড টেনিসন। শোন মুস্তৌফী, আমি চার লাখ আদায় করব, সাবিত্রী দেবীর দুই, তোমার দুই। এর বেশী

চাইলে কুমার ভড়কে যেতে পারেন। তা ছাড়া আমাদের এদেশে আসার খরচ আর পারিশ্রমিকও তাঁকে দিতে হবে। ব্যাংক অভ বেঙ্গলে সাবিত্রীর অ্যাকাউণ্ট আছে, কুমার সেখানে চার লাখ জমা দিলেই তাঁকে নীল তারা সমর্পণ করব। আজ সন্ধ্যায় তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

—সাবিত্রীর ঠিকানা কি?

—তিন নম্বর কর্নওআলিস থার্ড লেন। মুস্তৌফী, আজই বিকালে তাঁর কাছে যেও। আশা করি তোমার কুসংস্কার নেই, বিধবা হলেও বাগ্‌দত্তা পাত্রীকে বিবাহ করতে রাজী আছ?... তবে আর ভাবনা কি, go, woo and win her। কাল-সকালে হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। গুড বাই।

ওআটসন বললেন, এক্সকিউজ মি মুস্তৌফী বাবু দাড়িটা কামিয়ে ফেলো। গুড বাই।

রাখাল বিকালে চারটের সময় সাবিত্রীর কাছে গিয়ে রাত সাড়ে আটটায় ফিরে এল। তার ছাত্র নারান বারান্দায় বসে ছিল। রাখাল বলল, কে ও নারান নাকি? হ্যারিকেনটা উসকে দে।

আলো বাড়িয়ে দিয়ে নারান বলল, একি মাষ্টার মশায়, আপনাকে যে চেনাই যায় না!

—দাড়িটা কামিয়ে ফেলেছি। এত রাত্রে তুই যে এখানে?

—বাঃ ভুলে গেছেন! আপনি যে বলেছিলেন, আজ সন্ধ্যে-বেলা ব্যাট্‌ল অভ সেজমুর পড়াবেন।

—দুত্তোর সেজমুর, ও আর এক দিন হবে। আজ ট্রামে আসতে আসতে কি একটা বানিয়েছি শুনবি?—বরষে ধারা, ভূমি শীতল, তাপিত তরু পেয়েছে জল; টানিছে রস তৃষিত মূল, ধরিবে পাতা ফুটিবে ফুল। তোদের হেম বাঁড়ুজ্যে নবীন সেন পারে এমন লিখতে?

১৩৬১

তিলোত্তমা

সিদ্ধিনাথের নাম আপনারা শুনে থাকবেন।* বিদ্যার খ্যাতি আছে, সরকারী কলেজে পড়াতেন, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় চাকরি ছেড়ে তিন বৎসর প্রায় নিষ্কর্মা হয়ে বাড়িতে বসে ছিলেন। এখন ভাল আছেন, শিবচন্দ্র কলেজে পড়াচ্ছেন। সম্প্রতি কুবুদ্ধির উৎপত্তি সম্বন্ধে থিসিস লিখে পিএচ. ডি. ডিগ্রী পেয়েছেন।

সিদ্ধিনাথের বাল্যবন্ধু উকিল গোপাল মুখুজ্যের বাড়িতে যথারীতি সান্ধ্য আড্ডা বসেছে। উপস্থিত আছেন—গোপালবাবু, তাঁর পত্নী নমিতা, নমিতার ছোট বোন (সিদ্ধিনাথের ভূতপূর্ব ছাত্রী) অসিতা, অসিতার স্বামী রমেশ ডাক্তার, আর সিদ্ধিনাথ। সিদ্ধিনাথের বাড়ি খুব কাছে। তাঁর স্ত্রী নবদুর্গা একটু সেকেলে, এই মেয়ে-পুরুষের আড্ডায় তিনি আসেন না।

আড্ডারম্ভে গোপালবাবু বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, তুমি ডক্টরেট পেয়েছ তাতে আমরা সবাই খুব খুশী হয়েছি। এই সম্মান তোমার বিদ্যের তুলনায় অবশ্য কিছুই নয়, তবে শোনায় ভাল — ডক্টর সিদ্ধিনাথ ভট্টাচার্জি। নমিতা তোমাকে আর অশ্রদ্ধা করতে পারবে না।

নমিতা বললেন, ডক্টর একটা নিতান্ত বাজে উপাধি, গণ্ডা

* সিদ্ধিনাথের পূর্বকথা 'গল্পকল্প' পুস্তকে আছে।

গণ্ডা ডক্টর পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমি ওঁকে একটি ভাল উপাধি দিচ্ছি—বকবক্তা।

অসিতা বলল, মানে কি দিদি ?

—মানে খুব সোজা। যে বকে সে বক্তা, আর যে বকবক করে সে বকবক্তা।

সিদ্ধিনাথ বললেন, থ্যাংক ইউ নমিতা দেবী, আপনার প্রদত্ত উপাধিটির মর্যাদা রাখতে আমি সর্বদাই চেষ্টা করব।

নমিতা বললেন, তবে আর সময় নষ্ট করেন কেন, আপনার বকবক্তৃতা এখনই শুরু করুন না।

—কোন্ বিষয় শুনতে চান ? শংকরের অদ্বৈতবাদ, মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, শরীরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, না পরলোক-তত্ত্ব ?

গোপালবাবু বললেন, ওসব নীরস তত্ত্ব শুনতে চাই না। প্রেমের কথা যদি তোমার কিছু জানা থাকে তো তাই বল।

—হাড়ে হাড়ে জানা আছে। আমি নিজেই একবার বিশ্রী রকম প্রেমে পড়েছিলুম।

নমিতা বললেন, আস্পর্ধা কম নয়! বাড়িতে পাহারাওয়ালী গিন্নী থাকতে প্রেমে পড়লেন কোন্ আক্কেলে? বলতে লজ্জা হয় না ?

—মানুষের যা স্বাভাবিক ধর্ম তা স্বীকার করতে লজ্জা হবে কেন। আপনার মুখেই তো শুনেছি যে অসিতার বউভাতের ভোজে আপনি গবগব করে চার গণ্ডা ভেটকি মাছের ফ্রাই খেয়ে-

১৮৪৮

ছিলেন। তার জন্যে তো আপনাকে রাক্কুসী কি মেছোপেতনী বলছি না।

গোপালবাবু বললেন, আঃ ঝগড়া কর কেন। নমিতা, সিধুকে বলতে দাও, তোমার মন্তব্য শেষে ক'রো।

সিদ্ধিনাথ বলতে লাগলেন।—ব্যাপারটা ঘটেছিল আমার বিবাহের আগে, গিন্নী থাকতে প্রেম হবার জো কি! তখন বয়স বাইশ-তেইশ, পোস্টগ্রাজুয়েটে পড়ি, বাবা মা দুজনেই বর্তমান। ওহে রমেশ ডাক্তার, তোমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে তো—কোনও দেশে একটা নতুন ব্যাধি যদি আসে তবে প্রথম প্রথম তা মারাত্মক হয়, কিন্তু দু-এক শ বছর পরে তার প্রকোপ অনেক কমে যায়?

রমেশ বলল, আজ্ঞে হাঁ, কোনও কোনও রোগের বেলা তাই হয় বটে।

—প্রেমও সেই রকম ব্যাধি। এর তিন দশা আছে। প্রাইমারি স্টেজে প্রেম হল নাইন্টি পারসেন্ট লালসা, টেন পারসেন্ট ভাল-বাসা। সেকণ্ডারি স্টেজে হাফ অ্যান্ড হাফ। টারশারিতে প্রায় সবটাই ভালবাসা, নামমাত্র লালসা। পুরাকালে পূর্বরাগ অর্থাৎ প্রেমের প্রথম আক্রমণ অতি সাংঘাতিক হত। কাদম্বরীতে বাণ-ভট্ট লিখেছেন—মহাশ্বেতার প্রেমে পড়ে পুণ্ডরীক হার্ট ফেল করে মারা যায়। আরব্য উপন্যাসের অনেক নায়ক নায়িকা প্রেমে শয্যাশায়ী হত। অমন যে জবরদস্ত রাজর্ষি আরংজেব বাদশা,

তিনিও প্রথম যৌবনে গোলকণ্ডার এক নবাবনন্দিনীকে দেখে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। আজকাল এরকম বড় একটা দেখা যায় না, কারণ মেয়ে পুরুষ সবাই খুব হিসেবী হয়েছে, তা ছাড়া দেদার প্রেমের গল্প প'ড়ে আর সিনেমার ছবি দেখে দেখে খানিকটা ইমিউনিটিও এসেছে। কিন্তু দৈবক্রমে আমি যে প্রেমের কবলে পড়েছিলুম তা সেই সেকেলে ভিরুলেন্ট টাইপের। তবে বেশী ভুগতে হয় নি, পাঁচ দিনের মধ্যেই সেরে উঠি।

নমিতা বললেন, কিসে সারল, পেনিসিলিন না খ্যাপা কুকুরের ইনজেকশনে?

—ওষুধের কাজ নয়। গুরুর কৃপায় সেরেছিল।

—আপনি তো পাষণ্ড লোক, আপনার আবার গুরু কে?

—যিনি জ্ঞানদাতা বা শিক্ষাদাতা তিনিই গুরু। সম্প্রতি আমার দুটি গুরু জুটেছে—আমার ছাত্র পরাশর হোড়, আর এ পাড়ার বকাট ছোকরা গুলচাঁদ। পরাশরের কাছে কবিতা রচনা শিখছি, আর গুলচাঁদের কাছে বাইসিক্‌ল চড়া।

অসিতা বলল, সার, আপনি তো বলতেন যে কাব্যচর্চা আর গাঁজা খাওয়া দুই সমান, তবে শিখছেন কেন? কিছু লিখছেন নাকি?

—রাম বল। লেখবার জন্যে শিখছি না, শুধু কবিতা লেখার প্যাঁচটা জানতে চাই। আর বাইসিক্‌ল শিখছি ট্রাম-বাসের ভাড়া বাঁচাবার জন্যে। দেখ অসিতা, কবিতা লেখা অতি সোজা কাজ, মাস খানিক প্র্যাকটিস করলে তুমিও পারবে, হয়তো তোমার

দিদিও বছর খানিক চেষ্টা করলে পারবেন। কেন যে লোকে কবিদের খাতির করে—

নমিতা বললেন, বাজে কথা রাখুন। কার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল? অত চট করে সারলই বা কি করে? প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাকে ঠেঙিয়েছিল নাকি?

—ধৈর্য ধরুন, যথাক্রমে সবই শুনবেন। প্রেমে পড়ার চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই কাবু হয়েছিলুম। আহারে রুচি নেই, মাথা টিপটিপ করে, বুক ঢিপঢিপ করে, ঘুম মোটেই হয় না, লেখাপড়া চুলোয় গেল, চব্বিশ ঘণ্টা শয্যাশায়ী। মা বললেন, হাঁরে সিধু, তোর হয়েছে কি? কপালটা যেন ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে। বাবা ডাক্তার ডাকালেন। নাড়ী জিব বুক পেট সব দেখে ডাক্তার বললেন, ডেংগু মনে হচ্ছে, ভয়ের কারণ নেই, নড়াচড়া বন্ধ রাখবে, লিকুইড ডায়েট চলবে। এক আউন্স ক্যাস্টর অয়েল এখনই খাইয়ে দিন, আর দশ গ্রেন কুইনীন নেবুর রস দিয়ে জলে গুলে এবেলা একবার ওবেলা একবার। মুখটা তেতো রাখা দরকার।

রামদাস কাব্যসাংখ্যবেদান্তচুঞ্চু তখন ইউনিভার্সিটিতে প্রাচ্য-দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। এখন তিনি নাগপুরে আছেন। বয়স বেশী নয়, আমার চাইতে ছ-সাত বছরের বড়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা একটু রসিক হয়ে থাকেন। রামদাসও রসিক লোক, ছাত্রদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। আমাকে তিনি বিশেষ রকম স্নেহ করতেন, কারণ বিদ্যায় আর রূপে আমিই ক্লাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলুম।

নমিতা বললেন, জন্ম ইস্তক বিদ্যের জাহাজ ছিলেন তা না হয় মানলুম, কিন্তু রূপ আবার কোথায় পেলেন? এই তো গুলিখোরের মতন চেহারা, গরুর মতন ড্যাবডেবে চোখ, শুওর-কুঁচির মতন চুল—

—সকলেই আপনার মতন অন্ধ নয়, সমঝদার রূপদর্শী লোক ঢের আছে। দু দিন আমাকে ক্লাসে দেখতে না পেয়ে চুঞ্চু মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, সিদ্ধিনাথ কামাই করছে কেন? ছাত্ররা বলল, তার ভারী অসুখ। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বাবার বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে চুঞ্চু মশায় মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসতেন। অসুখ শুনে আমাকে দেখতে এলেন।

নমিতা বললেন, বকবক করে শুধু বাজে কথা বলছেন। প্রেমে পড়লেন অথচ প্রেমপাত্রীটির কোনও খবর নেই। তার নাম কি, পরিচয় কি, দেখতে কেমন, সব বৃত্তান্ত খুলে বলুন, আপনার রামদাস চুঞ্চুর কথা শুনতে চাই না।

—ব্যস্ত হবেন না, কি জাতি কি নাম ধরে কোথায় বসতি করে সবই শুনতে পাবেন। মেয়েটি দেখতে কেমন তা জানবার জন্যে ছটফট করছেন, নয়? আচ্ছা এখনই বলে দিচ্ছি—অতি সুশ্রী গৌরী তন্বী, আপনার মতন গোবদা নয়, হিংসুটেও নয়। গোপাল কি দেখে যে আপনার প্রেমে মজেছে তা বুঝতেই পারি না।

—বোঝবার কোনও দরকার নেই, পরচর্চা না করে নিজের কথা বলুন।

—শুনুন। চুণ্ডু মশায় যখন দেখতে এলেন তখন আমার ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি চিতপাত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, কপালে ওডিকলোনের পটি, চোখে উদাস করুণ দৃষ্টি, মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে আঃ ইঃ উঃ এঃ ওঃ প্রভৃতি কাতর ধ্বনি বেরুচ্ছে।

রামদাস প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে সিদ্ধিনাথ?

বললুম, কি জানি সার। শরীর অত্যন্ত খারাপ, বড় যন্ত্রণা, আমি আর বাঁচব না।

চুণ্ডু মশায় আমার নাড়ী দেখলেন, চোখ দেখলেন, বুকে আর পিঠে হাত বুলুলেন। তার পর ঠোঁট কুঁচকে মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ, সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে।

—কিসের লক্ষণ পণ্ডিত মশায়?

—সাত্ত্বিক বিকারের অষ্ট লক্ষণ প্রকট হয়েছে—স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ বেপথু বৈবর্ণ্য অশ্রু মূর্ছা।

—সাত্ত্বিক বিকার মানে কি সার?

—মানে, তুমি ঘোরতর প্রেমে পড়েছ, সুদুস্তর পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছ। ঠিক বলেছি কি না?

আমি ঢাকবার চেষ্টা করলুম না, বললুম, আজ্ঞে ঠিক।

—পাত্রীটি কে? নাম ধাম বলে ফেল, যদি অলঙ্ঘনীয় বাধা না থাকে তবে সম্বন্ধের চেষ্টা করব।

—কোনও আশা নেই সার, বৈবাহিক অবৈবাহিক কোনও সম্পর্কই হবার জো নেই। আমার নাগালের একদম বাইরে।

চুণ্ডু মশায় বললেন, যদি নাগালের বাইরেই হয় এবং কোনও আশা না থাকে তবে বৃথা তার চিন্তা করছ কেন? মন থেকে একবারে মুছে ফেল।

—চেষ্টা তো করছি, কিন্তু পারছি না যে।

—আচ্ছা, তার ব্যবস্থা আমি করছি। আগে তার পরিচয় দাও।

আমি সবিস্তারে পরিচয় দিলুম। তাকে সিনেমায় দেখেছি, তিলোত্তমা ছবিতে নায়িকার পার্টে—

নমিতা বললেন, আরে রাম রাম, ছি ছি, এত ভনিতার পর সিনেমার অ্যাকট্রেস! ইস্কুলের চ্যাংড়া ছেলেরাই তো সে রকম প্রেমে পড়ে। ডক্টর সিদ্ধিনাথ বকবক্তার নজর অত ছোট তা মনে করি নি, উঁচুদরের কিছু আশা করেছিলুম। অন্তত একটি পিস্তলওয়ালী অগ্নিদিদি, কিংবা নাটোরের বনলতা সেন।

অসিতা বলল, অমন আশা তোমার করাই অন্যায় দিদি, এঁর তো তখন কম বয়স, ডক্টর বা বকবক্তা কোনও খেতাবই পান নি।

সিদ্ধিনাথ বললেন, ছি ছি করবার কোনও কারণ নেই, আমার মনোরথে আকাশের নক্ষত্র জোতা ছিল। তিলোত্তমা ছবিতে সে নায়িকা সাজত, তার নিজের নামও তিলোত্তমা। তার বাপ আর ঠাকুন্দা বাঙালী, ঠাকুমা বর্মী, মা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, দিদিমা ইংরেজ, দাদামশায় পঞ্জাবী। অ্যাভারেজ বাঙালী মেয়ে মোটেই সুশ্রী নয়। জারুল কাঠের মতন গায়ের রং, ছোট ছোট চোখ, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত মুখের হাঁ—যেন ইঁদুর ধরা

জাঁতিকল, মোটা ঠোঁট, থুতনি এতটুকু। বিশ্বাস না হয় তো আরশিতে মুখ দেখবেন।

নমিতা বললেন, বাঙালী পুরুষদের চেহারা কেমন তা শুনবেন? চোয়াড়ে গড়ন, আবলুস কাঠের মতন রং—

সিদ্ধিনাথ হাত নেড়ে বললেন, থামুন থামুন, যা বলবার গোপালকে আড়ালে বলবেন, অন্যের কাছে পতিনিন্দা মহাপাপ। যা বলছিলুম শুনুন। তিলোত্তমার দেহে চার জাতের রক্ত মিশেছিল, সেজন্যই সে অসাধারণ সুন্দরী। গোড়ালি পর্যন্ত চুল, চাঁপা ফুলের মতন রং—

অসিতা বলল, রং কি করে টের পেলেন সার? তখন তো টেকনিকলার হয় নি।

— রংটা অনুমান করেছিলুম। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা, পীনস্তনী, নিবিড়নিতম্বা। কালিদাস যাকে বলেছেন—যুবতিবিষয়ে বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি।

নমিতা বললেন, বিধাতার সৃষ্টি থোড়াই, আপনি আদেখলে হাঁদা ছিলেন তাই আসল রূপ টের পান নি। রং সুর্মা পরচুল তুলো আর খড় দিয়ে কি গড়া যায় তার কোনও আইডিয়াই আপনার নেই।

—হুঁ, রামদাস চুণ্চুও তাই বলেছিলেন বটে। তার পর শুনুন। তিলোত্তমার গলার আওয়াজ এত মিষ্টি যে তা বলবার নয়।

—উপমা খুঁজে পাচ্ছেন না? রূপলী কণ্ঠস্বর বলা চলবে?

—ও হল ইংরিজীর অন্ধ নকল, কণ্ঠস্বর সোনালী রুপুলী হয় না। সোনা রুপোর আওয়াজও ভাল নয়। বরং স্টীলের তারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে, যেমন বীণার ঝংকার কিংবা দামী ঘড়ির গংএর ডিং ডং। তার পর শুনুন। রামদাস চুণ্ডু তিলোত্তমার বিবরণ শুনে প্রশ্ন করলেন, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে ?

বললুম, আলাপ কোত্থেকে হবে সার, সে থাকে বোম্বাইএ। তাকে কোনও দিন সশরীরে দেখি নি, শুধু ছবিতেই তার মূর্তি দেখেছি, ছবিতেই তার কথা আর গান শুনেছি।

চুণ্ডু মশায় সহাস্যে বললেন, বেশ বেশ! কায়া দেখ নি, শুধু ছায়া দেখেছ। এখন শুয়ে শুয়ে ছায়াও দেখছ না, শুধু মায়া দেখছ। ভয় নেই, আমি তোমাকে উদ্ধার করব। সাংখ্য দর্শনে বলে—প্রকৃতি এক, আর পুরুষ অনেক। পুরুষ আসলে শুদ্ধ বুদ্ধ নির্বিকার, কিন্তু তার সামনে যখন প্রকৃতি সেজেগুজে নৃত্য করে তখন পুরুষের বিকার হয়, সে ভবযন্ত্রণা ভোগ করে। প্রজ্ঞা লাভ করলেই পুরুষের নেশা ছুটে যায়, প্রকৃতি অন্তর্হিত হয়। তুমি একজন পুরুষ, তিলোত্তমারূপা প্রকৃতি তোমার সামনে নেচেছিল, এখনও তোমার মনের মধ্যে নাচছে, তাই তোমার এই দুর্দশা। বৎস সিদ্ধিনাথ, প্রবুদ্ধ হও, তোমার পৌরুষ দেখাও, প্রকৃতিকে ধমক দিয়ে বল, দূর হ মায়াবিনী, ভাগো, গেট আউট। ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মোহমুক্ত হয়ে কৈবল্য লাভ কর।

আমি বললুম, ওসব তত্ত্বকথায় কিছুই হবে না সার।

—বেশ, সাংখ্যে যদি কাজ না হয় তবে অদ্বৈতবাদ শোন। এই জগতে হরেক রকম যা দেখছ তার কোনও অস্তিত্ব নেই, শুধুই মায়া। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তিনি পুরুষ নন, স্ত্রী নন ক্লীবলিঙ্গ, এবং তুমিই সেই ব্রহ্ম।

—বলেন কি সার! আপনি ব্রহ্ম নন?

—আমিও ব্রহ্ম। তিলোত্তমা, তোমার সহপাঠীরা, তোমাদের ভাইসচ্যান্সেলার, প্রত্যেকেই ব্রহ্ম। সবাই এক, শুধু মায়ার জন্য আলাদা আলাদা বোধ হয়।

— আপনি বলতে চান তিলোত্তমা আর আমাদের বাড়ির কুঁজী বুড়ী ঝি দুইই এক?

—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুন্দর বা কুৎসিত, সাধু বা অসাধু, সব তুল্যমূল্য, এক পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজমান। বোকা লোক মনে করে এক সের তুলোর চাইতে এক সের লোহা বেশী ভারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুইএরই ওজন সমান।

—মানি না সার। আপনি নীচের ওই উঠনে দাঁড়ান, আমি দোতলা থেকে আপনার মাথায় এক সের তুলো ফেলব, তার পর এক সের লোহা ফেলব। তার পরেও যদি বেঁচে থাকেন তবে আপনার কথা মানব।

অট্টহাস্য করে চুঞ্চু মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, গুরুমারা বিদ্যে এখনও তোমার হয় নি, একটু সায়েন্স প'ড়ো। তুমি

গুরুত্ব আর আপেক্ষিক গুরুত্ব, ভার আর সংঘাত গুলিয়ে ফেলেছ।

আমি বললুম, যাই বলুন সার, আপনার অদ্বৈতবাদে কোনও ফল হবে না। তিলোত্তমা হচ্ছে অলোকসামান্যা নারী, তার সঙ্গে অন্য কারও তুলনাই হতে পারে না। তার চেহারা অভিনয় আর গান আমাকে জাদু করেছে।

চুণ্ডু মশায় বললেন, তবে কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ কর, যাকে বলে কমন সেন্স। পক্ষিরাজ ঘোড়া, আকাশকুসুম, শিংওয়ালা খরগোশ এ সবে বিশ্বাস কর?

—আজ্ঞে না, ওসব তো কল্পনা, কিন্তু তিলোত্তমা বাস্তব।

—একবারেই ভুল। কবি খুব হাতে রেখেই বলেছেন, অর্ধেক কল্পনা তুমি অর্ধেক মানবী। তোমার তিলোত্তমা অর্ধেক নয়, পনরো আনা কল্পনা। তুমি তার কতটুকু জান হে ছোকরা? তার মূর্তিটা জোড়াতালি দিয়ে তৈরী; তার ভাষা নিজের নয়, নাট্যকারের; তার গানও নিজের নয়, অন্য মেয়ে আড়াল থেকে গেয়েছে। একটা কৃত্রিম মানবীর চিত্রার্পিতা ছায়া দেখে তুমি ভুলেছ। তার মেজাজ তুমি জান না, হয়তো খেঁকী কুঁদুলী, হয়তো নেশা করে, হয়তো দেমাকে মটমট করছে, হয়তো তার কালচারও বিশেষ কিছু নেই।

একটু ভেবে আমি বললুম, পণ্ডিত মশায়, আপনার কথা শুনে এখন মনে পড়ছে—তিলোত্তমা সরোবরকে সড়োবড়, জিহ্বাকে জেহোভা, আর প্রেমকে ফ্রেম বলেছিল।

—তবেই বোঝ। তুমি আবার ভীষণ খুঁতখুঁতে। যদি তোমাদের মিলন হয়, তার সঙ্গে তুমি যদি ঘর কর, তবে দুদিনেই তার গ্ল্যামার লোপ পাবে। সেকালে কলকাতায় একজন অতি শৌখিন বনেদী বড়লোক ছিলেন। তিনি রোজ সন্ধ্যায় তাঁর রূপসী রক্ষিতার বাড়িতে যেতেন, দুপুর রাতে বাড়ি ফিরতেন। কোনও কারণে দুদিন তিনি যেতে পারেন নি। বিরহযন্ত্রণা সইতে না পেরে তৃতীয় দিনে ভোর বেলায় তিনি হাজির হলেন। দেখলেন, তাঁর প্রেয়সী গামছা পরে গাড়ু হাতে কোথায় চলেছেন। তাই দেখে ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়ে বললেন, এঃ, তুমি—তুমি—

নমিতা বললেন, আপনি অতি অসভ্য, মুখে কিছুই বাধে না।

—ও তো আমি বলি নি, গুরুমুখে যা শুনেছি তাই আবৃত্তি করেছি। প্রেয়সীর সেই অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃত রূপ দেখে ভদ্র-লোকের মোহ কেটে গেল, তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে বৃন্দা-বনবাসী হলেন।

নমিতা বললেন, আপনার নিজের কি হল তাই বলুন।

—তার পর চুঞ্চু মশায় বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, এখন তোমাকে আসল তিলোত্তমার ইতিহাস বলছি শোন। সুন্দ উপসুন্দ দুই ভাই ছিল হরিহরাত্মা। তাদের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা বললেন, ভয় নেই, আমি দুদিনেই ওদের সাবাড় করে দিচ্ছি। তিনি ব্রাহ্মী মায়ায়

এক সিন্থেটিক ললনা সৃষ্টি করলেন। জগতের যাবতীয় সুন্দর বস্তুর তিল তিল উপাদানের সংযোগে তৈরী সেজন্য তার নাম হল তিলোত্তমা। তার ট্রায়াল দেখবার জন্য দেবতারা ব্রহ্মসভায় সমবেত হলেন। ব্রহ্মার চার দিকে ঘুরে ঘুরে তিলোত্তমা নাচতে লাগল। পিতামহ প্রবীণ লোক, চক্ষুলজ্জা আছে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পারেন না, অথচ দেখবার লোভ ষোল আনা। অগত্যা তাঁর ঘাড়ের চার দিকে চারটে মুণ্ডু বার হল। ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্র লোচন ফুটে উঠল, তাই দিয়ে তিনি চোঁ চোঁ করে তিলোত্তমার রূপসুধা পান করতে লাগলেন। অনেক ক্ষণ নাচ দেখে ব্রহ্মা বললেন, বাঃ, খাসা হয়েছে, এখন তুমি সুন্দ উপসুন্দর কাছে গিয়ে তাদের সামনে নৃত্য কর। তিলোত্তমা তাই করল। তাকে দখল করবার জন্য দুই ভাই কাড়াকাড়ি মারামারি করে দুজনেই মরল। দেবতারা নিরাপদ হলেন। ইন্দ্র বললেন, তিলোত্তমা, আমার সঙ্গে অমরাবতীতে চল, শচীকে বরখাস্ত করে তোমাকেই ইন্দ্রাণী করব। বিষ্ণু বললেন, খবরদার, তিলোত্তমার দিকে নজর দিও না, ও বৈকুণ্ঠে যাবে, আমার পদসেবা করবে। মহেশ্বর বললেন, ওহে বিষ্ণু, তোমার তো বিস্তর সেবাদাসী আছে, তিলোত্তমা আমার সঙ্গে কৈলাসে যাবে, পার্বতীর একজন ঝি দরকার। তখন ব্রহ্মা বেগতিক দেখে বললেন, তিলোত্তমে, স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়! তিলোত্তমা দড়াম করে ফেটে গেল, অ্যাটম বোমার মতন। তার সমস্ত সত্তা বিশ্লিষ্ট হল, যে উপাদান যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল—কান্তি বিদ্যুল্লতায়,

কেশরাশি মেঘমালায়, মুখচ্ছবি পূর্ণচন্দ্রে, দৃষ্টি মৃগলোচনে, ওষ্ঠরাগ পক্ক বিম্বে, দন্তরুচি কুন্দকলিকায়, কণ্ঠস্বর বেণুবীণায়, বাহু মৃণালদণ্ডে, পয়োধর বিল্বফলে, নিতম্ব করিকুম্ভে, উরু কদলীকাণ্ডে। পড়ে রইল শুধু একটু রেডিও-অ্যাকটিভ ধোঁয়া।

অসিতা বলল, তিলোত্তমার মন কোথায় ফিরে গেল তা তো বললেন না সার।

—তার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার কিছুই ছিল না, আত্মাও ছিল না। তিলোত্তমা একটা রোবট। পুরাণকথা শেষ করে চুঞ্চু মশায় প্রশ্ন করলেন, বৎস সিদ্ধিনাথ, এখন কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করছ কি? মোহ অপগত হয়েছে?

আমি লাফ দিয়ে উঠে বললুম, একদম সেরে গেছি সার। আমার মানসী তিলোত্তমাও এক্সপ্লোড করে বিলীন হয়েছে।

চুঞ্চু মশায় বললেন, এখনও বলা যায় না, কিছু ধোঁয়া থাকতে পারে। দেখ সিদ্ধিনাথ, তোমার চটপট বিবাহ হওয়া দরকার, তোমার বাপ মায়েরও সেই ইচ্ছে। আমার ছোট শালী নবদুর্গা দেখতে নেহাত মন্দ নয়, কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে তাকে একবার দেখো।

আমি উত্তর দিলুম, দেখবার দরকার নেই সার। ছায়া দেখে একবার ভুলেছি, কায়া দেখে আর ভুলতে চাই না। ওই নবদুর্গা না বনদুর্গা কি নাম বললেন, ওকেই বিয়ে করব। আপনি যখন বলছেন তখন আর কথা কি।

চুণ্ডু মশায় বললেন, ঠিক বলেছ সিদ্ধিনাথ। দশ মিনিট দেখে তুমি কি আর বুঝবে, আমি তো দশ বছরেও নবদুর্গার দিদি জয়দুর্গার ইয়ত্তা পাই নি। বিবাহ হয়ে যাক, তার পর ধীরে সুস্থে যত দিন খুশি দেখো।

তার পর চুণ্ডু মশায় বাবাকে বললেন, বাবা মা রাজী হলেন, দু মাসের মধ্যে নবদুর্গার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

গোপালবাবু বললেন, সিদ্ধিনাথের ইতিহাস তো শেষ হল, এখন নমিতা তোমার মন্তব্য বলতে পার।

নমিতা বললেন, আপনার গিন্নীকে এই কেচ্ছা শুনিয়েছেন?

সিদ্ধিনাথ বললেন, শুনিয়েছি। আরও অনেক রকম জীবন-স্মৃতি তাঁকে বলেছি, কিন্তু পতিবাক্যে তাঁর আস্থা নেই, আমার কোনও কথাই তিনি বিশ্বাস করেন না।

—জীবনস্মৃতি না ছাই, বকবক করে আবোলতাবোল বানিয়ে বলেছেন। আগাগোড়া মিথ্যে, শুধু নবদুর্গা সত্যি।

১৩৬১

জটাধরের বিপদ

নূতন দিল্লির গোল মার্কেটের পিছনের গলিতে কালীবাবুর বিখ্যাত দোকান ক্যালকাটা টি ক্যাবিন। এই আড্ডাটির নাম নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন।

সতরোই পৌষ, সন্ধ্যা ছটা। পেনশনভোগী বৃদ্ধ রামতারণ মুখুজ্যে, স্কুলমাষ্টার কপিল গুপ্ত, ব্যাংকের কেরানী বীরেশ্বর সিংগি, কাগজের রিপোর্টার অতুল হালদার, এবং আরও অনেকে আছেন। আজ নিউইয়ার্স ডে, সেজন্য ম্যানেজার কালীবাবু একটু বিশেষ আয়োজন করেছেন। মাংসের চপ তৈরি হচ্ছে। রামতারণবাবু নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক লোক, কালীবাড়ির বলি ভিন্ন অন্য মাংস খান না। তাঁর জন্য আলাদা উননে মাছের চপ ভাজবার ব্যবস্থা হয়েছে।

সিগারেট তামাক আর চপ ভাজার ধোঁয়ায় ঘরটি ঝাপসা হয়ে আছে, বিচিত্র গন্ধে আমোদিত হয়েছে। উপস্থিত ভদ্রলোকদের জনকয়েক পাশা খেলছেন, কেউ খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ বা রাজনীতিক তর্ক করছেন।

অতুল হালদার বললেন, ওহে কালীবাবু, আর দেরি কত? চায়ের জন্যে যে প্রাণটা চ্যাঁ চ্যাঁ করছে। কিন্তু খালি পেটে তো চা খাওয়া চলবে না, চটপট খানকতক ভেজে ফেল।

কালীবাবু বললেন, এই যে সার, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চপ রেডি হয়ে যাবে।

এমন সময় জটাধর বকশী প্রবেশ করলেন*। চেহারা আর সাজ ঠিক আগের মতনই আছে, ছ ফুট লম্বা মজবুত গড়ন, কাইজারী গোঁফ, গায়ে কালচে-খাকী মিলিটারী ওভারকোট, মাথায় পাগড়ির মতন বাঁধা কম্ফর্টার, অধিকন্তু কপালে গুটিকতক চন্দনের ফুটকি আর গলায় একছড়া গাঁদা ফুলের মালা। ঘরে ঢুকেই বাজখাঁই গলায় বললেন, নমস্কার মশাইরা, খবর সব ভাল তো?

বীরেশ্বর সিংগি একটু আঁতকে উঠলেন, রামতারণবাবু রেগে ফুলতে লাগলেন। কপিল গুপ্ত সহাস্যে বললেন, আসতে আজ্ঞা হক জটাধরবাবু, আপনি বেঁচে উঠেছেন দেখছি। আজকেও ভূত দেখাবেন নাকি?

পটকার মতন ফেটে পড়ে রামতারণবাবু বললেন, তোমাকে পুলিসে দেব, বেহায়া ঠক জোচ্চোর! ভূত দেখাবার আর জায়গা পাও নি!

জটাধর বকশী প্রসন্নবদনে বললেন, মুখুজ্যে মশায়ের রাগ হবারই কথা, আমার রসিকতাটা একটু বেয়াড়া রকমের হয়েছিল তা মানছি। মরা মানুষ সেজে আপনাদের ভয় দেখিয়েছিলুম সেটা ঠিক হয় নি। তার জন্যে আমি ভেরি সরি। মশাইরা যদি

* জটাধরের পূর্বকথা 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' পুস্তকে আছে।

একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনেন তো বুঝবেন আমার কোনও কুমতলব ছিল না।

রামতারণ মুখুজ্যে ক্রুদ্ধ বিড়ালের ন্যায় মৃদুমন্দ গর্জন করতে লাগলেন। কপিল গুপ্ত বললেন, কি বলতে চান বলুন জটাধরবাবু।

অতুল হালদারের পাশে বসে পড়ে জটাধর বললেন, মশাইরা নভেল পড়ে থাকেন নিশ্চয়? প্রেমের গল্প, বড় ঘরের কেচ্ছা, ডিটেকটিভ কাহিনী, রূপসী বোম্বেটে, এই সব? তার জন্যে কিছু পয়সাও খরচ করে থাকেন। কিন্তু বলুন তো, গল্পের বইএ কিছু সত্যি কথা পান কি? আজ্ঞে না, আপনারা জেনে শুনে পয়সা খরচ করে ডাহা মিথ্যে কথা পড়েন, তা শরৎ চাটুজ্যেই লিখুন আর পাঁচকড়ি দেই লিখুন। কেন পড়েন? মনে একটু ফুর্তি একটু সুড়সুড়ি একটু টিপুনি একটু ধাক্কা লাগাবার জন্যে। গল্প হচ্ছে মনের ম্যাসাজ, চিত্তের ডলাই মলাই, পড়লে মেজাজ চাঙ্গা হয়। আমি কি-এমন অন্যায় কাজটা করেছি মশাই? রামতারণবাবু প্রবীণ লোক, ওঁকে ভক্তি করি, ওঁর সামনে তো ছ্যাবলা প্রেমের কাহিনী বলতে পারি না, তাই নিজেই নায়ক সেজে একটি নির্দোষ পবিত্র ভূতের গল্প আপনাদের শুনিয়েছিলুম।

রামতারণ বললেন, তোমার চা চুরুট পানের জন্যে আমার যে সাড়ে চোদ্দ আনা গচ্চা গিয়েছিল তার কি?

—তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। ছ-সাত টাকার কমে আজকাল একটা

ভাল গল্পের বই মেলে না সার। আমি সেদিন অতি সস্তায় আপনাদের মনোরঞ্জন করেছিলুম।

কপিল গুপ্ত বললেন, যাই হক, কাজটা মোটেই ভাল করেন নি, আচমকা সবাইকে একটা শক দেওয়া অতি অন্যায়। আর একটু হলেই তো বীরেশ্বরবাবুর হার্ট ফেল হত।

জটাধর হাত জোড় করে বললেন, আচ্ছা, সে অপরাধের জন্যে মাপ চাচ্ছি, আজ তার দণ্ডও দেব। ও ম্যানেজার কালীবাবু মশাই, বিস্তর চপ ভাজছেন দেখছি, এক-একটার দাম কত? ছ আনা? বেশ বেশ। তা সস্তাই বলতে হবে, বড় বড় করেই গড়েছেন। ভাল মাস্টার্ড আছে তো? ছাতু গোলা নকল মাস্টার্ড চলবে না, তা বলে দিচ্ছি। এই ঘরে তেরো জন খাইয়ে রয়েছেন দেখছি, আমাকে আর কালীবাবুকে নিয়ে পনরো জন। প্রত্যেকে যদি গড়ে চারখানা করে চপ খান তা হলে পনরো ইন্টু চার ইন্টু ছ আনা, তাতে হয় সাড়ে বাইশ টাকা। তার সঙ্গে চা কেক পান তামাক ইত্যাদিও ধরুন সাড়ে বারো টাকা। একুনে হল পঁয়ত্রিশ টাকা। থামুন, আমার পুঁজি কত আছে দেখি।

জটাধর পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করলেন এবং নোট গনতি করে বললেন, কুলিয়ে যাবে, আমার কাছে গোটা পঞ্চাশ টাকা আছে। কালীবাবু, আপনি কিছু বেশী করেই মাল তৈরি করুন। এখন মশাইরা দয়া করে আমার সবিনয় নিবেদনটি শুনুন। আজ আপনারা সবাই আমার গেস্ট, আমার খরচে সবাই খাবেন। না না, কোনও আপত্তি শুনব না, আমার অনুরোধটি রাখতেই হবে, নইলে

মনে শান্তি পাব না।

কপিল গুপ্ত বললেন, ব্যাপার কি জটাধরবাবু, এত দিল-দরিয়া হলেন কেন?

জটাধরের মোটা গোঁফের নীচে একটি সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ঘাড় চুলকে মাথা নীচু করে বললেন, আপনারা হলেন ঘরের লোক, আপনাদের বলতে বাধা কি! কি জানেন, আজ বড় আনন্দের দিন, আজ আমার শুভবিবাহ—

রামতারণ বললেন, পৌষ মাসে শুভবিবাহ কি রকম? তুমি ব্রাহ্ম না খ্রীষ্টান? আজ বিবাহ তো তুমি এখানে কেন?

—আজ্ঞে, আমি খাঁটী হিন্দু। বিবাহের অনুষ্ঠানটি আজ বেলা এগারোটায় রেজিস্ট্রেশন অফিসে সেরে ফেলেছি। সিভিল ম্যারেজ তো পাঁজি দেখে হবার জো নেই, রেজিস্ট্রারের মর্জি মাফিক লগ্ন স্থির হয়। বিয়েটা চুকে গেলেই ভাবলুম, এখন তো দিল্লিতে আমার চেনা শোনা বেশী কেউ নেই, মাসতুতো ভাইএর বাসায় উঠেছি, সে আবার পেটরোগা মানুষ, ভাল জিনিস খাবার শক্তিই নেই। কিন্তু বিয়ের দিনে পাঁচ জনে মিলে একটু ফুর্তি একটু খাওয়া দাওয়া না করলে চলবে কেন? আপনাদের কথা মনে এল, ধরতে গেলে আমার আত্মীয় বন্ধু বরপক্ষ কন্যাপক্ষ সবই আপনারা, তাই এখানে চলে এলুম। আমাদের কালীবাবু দেখছি অন্তর্যামী, ফীস্ট তৈরি করেই রেখেছেন। যা আছে দয়া করে তাই আজ আপনারা খান। কিন্তু এখানে আপনাদের খাইয়ে তো আমার সুখ হবে না, আমার আস্তানায় একদিন আপনাদের

পায়ের ধুলো দিতেই হবে, বউভাত খেতে হবে। বেশী কিছু নয়, চারটি পোলাও, একটু মাংস, একটু পায়েস, আর ঘাঁশ্টওয়ালার দোকানের জাহানগিরী বালুশাই। মুখুজ্যে মশাই নিষ্ঠাবান লোক তা জানি, কালীবাড়ির পাঁঠাই আনব। আমার স্ত্রীর রান্না খুব চমৎকার, আপনারা খেয়ে নিশ্চয় তারিফ করবেন। আর একটি নিবেদন আছে সার। এখানকার মিউনিসিপাল অফিসে একটা কাজের চেষ্টা করছি, সার্ভেয়ার-আমিনের পোস্ট। মুখুজ্যে মশাই যদি দয়া করে একটু সুপারিশ করেন তো এখনি কাজটি পেয়ে যাই। ওঁকে সবাই খাতির করে কিনা।

রামতারণবাবু বললেন, তা না হয় একটা সুপারিশ পত্র লিখে দেওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার বয়েস তো পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি মনে হচ্ছে, এখন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করলে নাকি?

—আজ্ঞে না সার, এই সবে প্রথম পক্ষ। এত দিন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বিবাহে রুচিও ছিল না, ভেবেছিলুম নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা হল না, শেষটায় বন্ধনে জড়িয়ে পড়লুম। শুনবেন সব কথা সার?

রামতারণ বললেন, বেশ তো, শোনাই যাক তোমার কথা। অবশ্য যদি গোপনীয় কিছু না হয়।

জটাধর জিব কেটে বললেন, রাম বল, আমার জীবনে গোপনীয় কিছু নেই। এই জটাধর বকশী একটু আমুদে বটে, কিন্তু খাঁটী মানুষ, চরিত্রে কোনও কলঙ্ক পাবেন না। ও ম্যানেজার কালী-

বাবু, আপনি খাবার পরিবেশন করুন, খেতে খেতেই কথা হবে। শুনুন মশাইরা।—

যুদ্ধের সময় সত্যিই আমি নর্থ বর্মায় মিলিটারি চাকরি করতুম। বেয়াল্লিশ সালের গোড়ায় যখন জাপানীরা রেঙ্গুনে বোমা ফেলতে লাগল তখন ইংরেজের ওপর আর ভরসা রইল না, প্রাণের ভয়ে আমরা সবাই পালালুম। টামু-ইম্ফল রোড দিয়ে দলে দলে নানা জাতের মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো চলল, রোগে আর অপঘাতে কত যে মারা গেল তার সংখ্যা নেই। কাগজে সে সব কথা আপনারা পড়েছেন। অনেক কষ্টে আমি যখন বর্মা বর্ডার পার হয়ে ইম্ফলে এলুম তখন একটি মেয়ে আমার শরণাপন্ন হল। বড় করুণ কাহিনী তার, অল্প বয়সে অনেক দুঃখ পেয়েছে। স্বামীর নাম বলহরি জোয়ারদার, রেঙ্গুনে তার মোটর মেরামতের কারখানা ছিল, ভালই রোজগার করত। জাপানীরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, তাদের মোটর মেকানিকের বড় অভাব ছিল কিনা। যাবার সময় বলহরি তার বউকে বলল, অচলা, চললুম, এ জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না। তুমি যেমন করে পার পালাও, দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা কর। অচলা কাঁদতে কাঁদতে একটি বাঙালী দলের সঙ্গে রওনা হল। দলের সবাই একে একে মারা গেল, কলেরায়, টাইফয়েডে, বাঘের পেটে। অবশেষে অচলা আধমরা অবস্থায় মণিপুরে পৌঁছুল। আমার স্বভাবটা কি রকম জানেন, লোকের দুঃখ দেখতে পারি না, বিশেষ করে মেয়েছেলের।

অচলাকে বললুম, আমার সঙ্গেই চল, আমি যদি বেঁচে থাকি তুমিও বাঁচবে।

রামতারণবাবু প্রশ্ন করলেন, অচলার মা বাপ কোথা ছিল?

—হায় রে, তার আবার মা বাপ! তারা বহু কাল থেকে পেগু শহরে বাস করত, সেখানেই বলহরির সঙ্গে অচলার বিয়ে হয়। জাপানীরা এসে পড়লে অচলার মা বাপ ভাই বোন কে কোথায় পালাল, বাঁচল কি মরল, কেউ জানে না। তার পর শুনুন। অচলাকে নিয়ে তো কোনও গতিকে বিপদের গণ্ডি পেরিয়ে এলুম। তার পর মশাই বারো বচ্ছর নানা জায়গায় কাজ করেছি, ডিব্রুগড়ে, চাটগাঁয়ে, নোয়াখালিতে, রংপুরে, আরও অনেক স্থানে। কোনও চাকরিই স্থায়ী নয়, থিতু হয়ে কোথাও বাস করতে পারি নি। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে এই দিল্লিতে এসে পড়েছি। স্থির করেছি আর নড়ব না, এখানেই একটা কাজ জুটিয়ে নেব। কাজের যোগাড়ও প্রায় হয়েছে, এখন মুখুজ্যে মশাই একটু দয়া করলেই পেয়ে যাব।

রামতারণ বললেন, কন্‌ট্রাক্টর সেকেন্দর সিংকে আমি বলব, তার ইনফ্লুএন্স আছে, সে তোমার জন্যে চেষ্টা করবে। আচ্ছা, তুমি তো বহু কাল ভ্যাগাবন্ড হয়ে ঘুরেছ, অচলা অ্যাদ্দিন কোথায় ছিল?

—কোথায় আর থাকবে সার, আমার কাছেই ছিল। মেয়েটা বড় ভাল। রং তেমন ফরসা নয়, কিন্তু মুখের খুব শ্রী আছে। প্রথম প্রথম বড় কান্নাকাটি করত, তার পর ক্রমশ সামলে উঠল।

কিন্তু মাস দুই আগে দেখলুম আবার ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে অচলা? জবাব দিল, আমার মরণ হয় না কেন।...... আরে ব্যাপারটা কি খোলসা করেই বল না। অচলা বলল, তোমার জন্যে কি আমাকে বিষ খেয়ে জলে ডুবে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে?......ভাল জ্বালা, আরে আমার অপরাধটা কি? অচলা বলল, লোকে যে আমার বদনাম রটাচ্ছে, তা শুনতে পাও না?...কি মুশকিল, তা আমাকে করতে বল কি? অচলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, অ জটাইবাবু, তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি কিচ্ছু নেই?

কপিল গুপ্ত বললেন, তা অচলা কিছু অন্যায় বলে নি।

জটাধর বললেন, না মশাই, অচলা অন্যায় বলে নি, আমারও বুদ্ধি শুদ্ধি বিলক্ষণ আছে। বিবাহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু প্রজাপতি যদি নারীর রূপ ধরে পিছনে লাগেন তবে তাঁর নির্বন্ধ এড়ানো পুরুষের সাধ্য নয়। কে এক কবি লিখেছেন না?—শারদ লতিকা সম ললিত ললনাকায়। বাজে কথা মশাই, ললনা হচ্ছেন ছিনে জোঁক। ভেবে দেখলুম অচলাকে বিয়ে করে ফেলাই ভাল। তার স্বামী বলহরির কোনও পাত্তাই নেই, নিশ্চয় মরেছে। কিন্তু হিন্দু পদ্ধতিতে বিয়ে করায় বিস্তর ঝঞ্ঝাট, তাই সিভিল ম্যারেজই স্থির করলুম। রেজিস্ট্রার লালা হন্সরাজ চোপরা অতি ভাল লোক। বললেন, বারো বছর যখন কেটে গেছে তখন ভাববার কিছু নেই, স্বচ্ছন্দে বিয়ে কর। তাই আজ বিয়ে করে ফেললুম।

রামতারণবাবু বললেন, কিন্তু একটা কর্তব্য যে বাকী রয়ে গেল, পূর্বের স্বামীর শ্রাদ্ধ করা উচিত ছিল।

—তা আর বলতে হবে না সার, আমার কাজে খুঁত পাবেন না। বারো বছর পূর্ণ হবা মাত্র অচলা তার লোহা আর শাঁখা ভেঙে ফেলল, সিঁদুর মুছল, থান পরল। তাকে দিয়ে দস্তুর মতন শ্রাদ্ধ করালুম, পাঁচটি ব্রাহ্মণও খাওয়ালুম। সবে তিন দিন আগে তার অশৌচান্ত হয়েছে। তার পর সিভিল ম্যারেজ চুকে যেতেই অচলা আবার সধবার লক্ষণ ধারণ করেছে। হাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল। ও কালীবাবু, এই সাতটা চপ আমি পকেটে পুরলুম, নিজে গবগবিয়ে খাব আর সহধর্মিণীকে কিছু দেব না তা তো হতে পারে না। তেমন স্বার্থপর আমি নই। বেচারী পনরো দিন নিরামিষ খেয়ে আছে। এই সাতটা চপের দামও আমি দেব।

অতুল হালদার বললেন, খুব ইন্টারেস্টিং ইতিহাস। আমি নোট করে নিয়েছি, আমাদের হিন্দুস্থান মিরর কাগজে ছাপব। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো জটাধরবাবু?

—কিছুমাত্র না, স্বচ্ছন্দে ছাপুন। যদি চান তো আরও ডিটেল দিতে পারি, অচলা আর আমার ফোটোও দিতে পারি।

এই সময় একটি লোক টি ক্যাবিনের দরজার কাছে এসে ভাঙা গলায় বলল, জটাধর বকশী এখানে আছে?

আগন্তুক লোকটি রোগা, বেঁটে, পরনে ময়লা খাকী প্যান্ট, নীল জার্সি, তার উপর মোটা পট্টুর বুক খোলা কোট, হাতে

একটা বড় রেঞ্চ। তার প্রশ্নের উত্তরে জটাধর বললেন, আমিই জটাধর বকশী। আপনি কে মশাই?

—তোমার যম। এই কথা বলেই লোকটি ঘরে এসে খপ করে জটাধরের হাত ধরল।

রামতারণ বললেন, কে হে তুমি, এখানে এসে হামলা করছ? জান, এ হল ট্রেসপাস, ক্রিমিন্যাল কেস। নাম কি তোমার?

—আমার নাম বলহরি জোয়ারদার। আপনাদের কিছু বলছি না মশাই, আমার দরকার এই শালা জটাধরের সঙ্গে।

রামতারণ বললেন, অ্যাঁ, অবাক কাণ্ড! তুমিই অচলার ভূত-পূর্ব স্বামী নাকি?

—শুধু ভূতপূর্ব নই মশাই, দস্তুর মতন জলজ্যান্ত বর্তমান স্বামী, ভবিষ্যতেও স্বামী। এই পাজী জটে শালাকে যদি জেলে না পাঠাই তো আমার নাম বলহরি জোয়ারদার নয়।

রামতারণ বললেন, আচ্ছা ফ্যাসাদ! কি হে জটাধর, এখন করবে কি?

জটাধর করুণ স্বরে বললেন, আমার সর্বনাশ হবে সার, আপনিই একটা ফয়সালা করুন। এই বলে জটাধর রামতারণের পা ধরলেন।

রামতারণ বললেন, স্থির হও জটাধর, এ সব ব্যাপারে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। মীমাংসা তো অচলার হাতে। সে যদি বলে, এই লোকটিই তার স্বামী, তবে আর কথা নেই, তোমাকে তাই মেনে নিতে হবে। ও জোয়ারদার মশাই, আপনি অচলার সঙ্গে

দেখা করেছেন?

—তা আর আপনাকে বলতে হবে না, তার কাছ থেকেই তো আসছি। আমাকে দেখে মাগী বেদম কান্না শুরু করেছে। আমি ধমক দিতে বলল, জটাইবাবুকে ডেকে আন, তাঁর অমতে কিছু করতে পারব না। ওঃ, জটাই যেন তাঁর গুরুঠাকুর!

রামতারণ বললেন, ব্যাপারটা বিশ্রী রকম জটিল হল দেখছি। অচলা যদি জটাধরের কাছেই থাকতে চায় আর বলহরি তাতে রাজী না হয় তবে তো মহা ফ্যাসাদ, আদালতের ব্যাপার। কিন্তু বেআইনী কাজ তো কিছুই হয় নি। নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে—একটা শাস্ত্রবচন আছে না? বারো বছর কেটে গেলে রীতিমত শ্রাদ্ধশান্তির পরে অচলার পুনর্বিবাহ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভূতপূর্ব স্বামীর ফিরে আসাই অন্যায়।

কপিল গুপ্ত বললেন, এনক আর্ডেনের মতন মানে মানে সরে পড়াই উচিত ছিল।

বলহরি বলল, আহা কি কথাই বললেন মশাই, প্রাণ জুড়িয়ে গেল! নিজের স্ত্রীর কাছে আসব না তো এই জটেকে দেখে জিব কেটে পালাব নাকি?

জটাধর বললেন, আমি এই বলহরি জোয়ারদার মশাইকে খেসারত হিসেবে কিছু টাকা দিতে রাজী আছি। এখন পঞ্চাশ দিতে পারি, বাসায় গিয়ে আরও পঞ্চাশ—

বলহরি গর্জন করে বলল, চোপ রও শুয়ার, একশ টাকায় আমার বউ কিনতে চাও? একটা পাঁঠীও ও দামে মেলে না।

কপিল গুপ্ত বললেন, ওহে জোয়ারদার, একটু বুঝে সুজে তম্বি ক'রো। তুমি তো তালপাতার সেপাই, জটাধরের চেহারাটি দেখছ তো? এক চড়েই তোমাকে সাবাড় করতে পারে।

—এঃ, চড় মারলেই হল! দেখছেন না, ব্যাটা ভয়ে কেঁচো হয়ে আছে। পাঁচটি বচ্ছর মাঞ্চুরিয়ার জাপানীদের কাছে ছিলাম মশাই, জুজুৎসুর পাঁচ ভাল করেই শিখেছি। তার পর চীনেদের সঙ্গে সাত বছর কাটিয়েছি। ছাড়তে কি চায়? তিনটে কমরেডকে গলা টিপে মেরে পালিয়ে এসেছি। জটাধরকে দুটি আঙুলের টোকায় কাত করতে পারি। চল্ হতভাগা।

,কাঁচপোকা যেমন প্রকাণ্ড আরশোলাকে ধরে নিয়ে যায় তেমনি বলহরি জোয়ারদার জটাধরের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলে গেল।

রামতারণ মুখুজ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! আহা বেচারা আজ দুপুরে বিয়ে করেছে আর সন্ধ্যাবেলায় এই বিশ্রী কাণ্ড। অচলা মেয়েটার জন্যে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে।

ম্যানেজার কালীবাবু নিবিষ্ট হয়ে হিসাব করছিলেন। এখন উচ্চস্বরে বললেন, চুলোয় যাক অচলা, আজকের খরচা দেবে কে? জটাধর তো আপনাদের বোকা বানিয়ে সরে পড়ল।

কপিল গুপ্ত বললেন, সরে পড়েছে তাতে হয়েছে কি? আমরা তো নিজের নিজের খরচে খেতে প্রস্তুতই ছিলুম। কালীবাবু, তুমি আমাদের নামে নামে বিল তৈরি কর।

কালীবাবু বললেন, কিন্তু ওই জটাধর যে নিজেই বারোটা চপ, চারখানা কেক, আর চারটে বড় পেয়ালা চা খেয়েছে, তা ছাড়া বউকে দেবে বলে সাতটা চপ পকেটে পুরেছে। মোট দাম হল ন টাকা ছ আনা। এ খরচ কে দেবে?

কপিল গুপ্ত বললেন, মোটে ন টাকা ছ আনা? দেড়খানা উপন্যাসের দাম। খরচটা আমাদের মধ্যেই চারিয়ে দাও, কি বলেন মুখুজ্যে মশাই? জটাধরের বিবেচনা আছে, বেশী ঠকায় নি।

বীরেশ্বর সিংগি বললেন, আমি তখনই বুঝেছিলুম যে ওই বলহরিই হচ্ছে জটাধরের মাসতুতো ভাই, সাতটা চপ তার পেটেই যাবে।

১৩৬১

তিরি চৌধুরী

করুণাময় দত্তগুপ্ত কৃতী পুরুষ, মুনসেফ থেকে ক্রমে ক্রমে জেলা জজ তার পর হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। ঈস্টারের বন্ধ, সকাল বেলা বাড়িতে খাস কামরায় বসে তিনি চা খাচ্ছেন আর খবরের কাগজ পড়ছেন এমন সময় একটি মেয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

ষোল-সতরো বছরের সুশ্রী মেয়ে, পরিপাটী সাজ। জস্টিস দত্তগুপ্ত তার দিকে তাকাতে সে বলল, আমার ঠাকুন্দাকে আপনি চেনেন, সলিসিটার্স চৌধুরী অ্যান্ড সন্‌সের প্রিয়নাথ চৌধুরী। আমার নাম তিরি।

করুণাময় বললেন, ও, তুমি প্রিয়নাথবাবুর নাতনী, আমাদের সোমনাথের মেয়ে? ব'স ওই চেয়ারটায়। তা, তোমার নাম তিরি হল কেন?

—কি জানেন, আমার মামা অঙ্কের প্রোফেসার, আর আমি হচ্ছি তৃতীয় সন্তান, তাই মামা আমার নাম রেখেছিলেন তৃতীয়া। নামটা কটমটে, আমি ছেঁটে দিয়ে তিরি করেছি।

—তা বেশ করেছ। এখন কি চাই বল তো?

—আজ্ঞে, আমার ঠাকুমা বড় দুর্ভাবনায় পড়েছেন, একবারে মুষড়ে গেছেন, ভাল করে খাচ্ছেন না, ঘুমুতে পারছেন না। দয়া

করে আপনি তাঁকে বাঁচান।

—ব্যাপারটা কি? যদি বৈষয়িক কিছু হয় তবে তোমার ঠাকুদ্দা আর বাবাই তো তার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

—বৈষয়িক নয়, হার্দিক।

—সে আবার কি?

—হার্টের ব্যাপার।

—তা হলে হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখাও, আমি তো তার কিছুই করতে পারব না।

—আপনি নিশ্চয় পারবেন সার। আপনি অনুমতি দিন, আজ সন্ধ্যে বেলা ঠাকুমাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

—তা না হয় এনো। কিন্তু কি হয়েছে তা তো আগে আমার একটু জানা দরকার।

—ব্যাপারটা গোপনীয়, ঠাকুমাই আপনাকে জানাবেন। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না সার, শুধু ঠাকুমাকে আশ্বাস দেবেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি কানে একটু কম শোনেন। আমি দরকার মতন আপনাকে প্রম্‌্ট করব, ফিসফিস করে বাতলে দেব।

করুণাময় সহাস্যে বললেন, ও, ঠাকুমার ব্যবস্থা তুমি নিজেই করবে, আমি শুধু সাক্ষিগোপাল হয়ে থাকব?

—আজ্ঞে হাঁ। আমার কথা তো ঠাকুমা গ্রাহ্য করবেন না, আপনার মুখ থেকে শুনলে তাঁর বিশ্বাস হবে। আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করেন কিনা। ঠাকুমা বলেন, হাইকোর্টের জজরা হচ্ছেন ধর্মের অবতার, হাইকোর্টের দৌলতেই ঠাকুদ্দা আর বাবা

করে খাচ্ছেন।

—বাঃ, ঠাকুমা তো বেশ বলেছেন! তোমার বাবা কি ঠাকুন্দা আসবেন না?

—না না না, তাঁরা এলে সব মাটি হবে। হাসবেন না সার, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ঠাকুমার দুশ্চিন্তা আমার জন্যে নয়, আমার কোনও স্বার্থ নেই।

—বেশ, আজ সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে এস।

সন্ধ্যার সময় তির্রি তার ঠাকুমাকে নিয়ে করুণাময়ের বাড়িতে উপস্থিত হল। নমস্কার বিনিময়ের পর তির্রি বলল, এই ইনি হচ্ছেন আমার ঠাকুমা শ্রীমতী কনকলতা চৌধুরানী, সলিসিটার প্রিয়নাথ চৌধুরীর স্ত্রী। আর ইনি হচ্ছেন মাননীয় মিস্টার জস্টিস শ্রীকরুণাময় দত্তগুপ্ত। ঠাকুমা, ইন্ট্রোডিউস করে দিলুম, এখন তুমি মনের কথা খোলসা করে বল।

কনকলতা ধমকের সুরে বললেন, আমি কেন বলতে যাব লা? বুড়ো মাগী, লজ্জা করে না বুঝি? তোকে এনেছি কি করতে? যা বলবার তুই বল।

তির্রি বলল, বেশ, আমিই বলছি। শুনুন ইওর লর্ডশিপ—

করুণাময় বললেন, বাড়িতে লর্ডশিপ নয়।

—আচ্ছা, শুনুন সার। আমার ঠাকুন্দাকে তো দেখেছেন, খুব সুপুরুষ, যদিও পঁচাত্তর পেরিয়েছেন। আর আমার এই

ঠাকুমাকেও দেখুন, বেশ সুন্দরী, নয়? যদিও সাতষট্টি বছর বয়সের দরুন একটু তুবড়ে গেছেন, পুরনো ঘটির মতন।

কনকলতা একটু কালা হলেও নিজের সম্বন্ধে কথা হলে বেশ শুনতে পান। বললেন, আরে গেল যা, ও সব কথা বলতে তোকে কে বলেছে?

তিরি বলল, এই সবই তো আসল কথা। তার পর শুনুন সার। পঞ্চান্ন বছর আগে, ঠাকুদ্দার বয়স যখন কুড়ি, তখন প্রভাবতী ঘোষ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়। বারো-তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে, ঠাকুদ্দা তাকে একবার দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু আমার প্রঠাকুদ্দা, অর্থাৎ ঠাকুদ্দার বাবা ছিলেন একটি অর্থগৃধ্র—

করুণাময় বললেন, অর্থগৃধ্নু?

—আজ্ঞে না, অর্থগৃধ্র, শকুনির মতন লোলুপ। তিনি পাঁচ হাজার টাকা বরপণ হেঁকে বসলেন। প্রভাবতীর বাবা ছিলেন গরিব ইস্কুল মাষ্টার, কোথায় পাবেন অত টাকা? সম্বন্ধ ভেস্তে গেল। ঠাকুদ্দা মনের দুঃখে দিন কতক হেমচন্দ্র আওড়ালেন— ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অভাগার। তার পর এই কনকলতা ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। তিনি ঠকেন নি, ছ হাজার টাকা বরপণ পেলেন, এক রূপসী হারিয়ে আর এক রূপসী ঘরে আনলেন।

করুণাময় প্রশ্ন করলেন, সেই আগেকার মেয়েটির কি হল?

—আমার সেই মাইট-হ্যাভ-বিন ঠাকুমা প্রভাবতীর? তিনি

কুমারী হয়েই রইলেন, খুব লেখাপড়া শিখলেন, অনেক জায়গায় মাষ্টারি করলেন, আমেরিকায় গিয়ে ডক্টর অভ এডুকেশন ডিগ্রী নিয়ে এলেন, শেষকালে পাতিয়ালা উইমিন্স কলেজের প্রিন্সিপালও হয়েছিলেন। সম্প্রতি রিটায়ার করে কলকাতায় এসেছেন। তার পর হঠাৎ একদিন সলিসিটার চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্সের আফিসে উপস্থিত। কি সমাচার? না, আলিপুরে একটা ছোট বাড়ি কিনবেন, তারই দলিল আমার ঠাকুদ্দাকে দেখাতে চান। ঠাকুদ্দা তাঁর পরিচয় পেয়ে খুব খুশী—বুঝতেই পারছেন, পুরাতনী শিখা, ওল্ড ফ্লেম। তার পর প্রভাবতী আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসতে লাগলেন, আর ঠাকুমা ফোঁস করে জ্বলে উঠলেন, কলেরা-পটাশ আর চিনিতে অ্যাসিড ঠেকালে যেমন হয়।

—সে আবার কি রকম? তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠাই তো শুনেছি।

—তার চাইতে ভীষণ। জানেন না সার? আমার মেজদা একদিন দেখিয়েছিল। কলেজ থেকে কলেরাপটাশ চুরি করে এনে তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে ন্যাকড়ার পুঁটলিতে বেঁধে তাতে কি একটা অ্যাসিড ঠেকাল, অমনি ফোঁস করে জ্বলে উঠল।

—প্রভাবতী দেখতে কেমন?

—এখনও খুব রূপ।

কনকলতা চেঁচিয়ে বললেন, শাঁকচুন্নী বাবা, একবারে শাঁক-চুন্নী!

করুণাময় হেসে বললেন, তবে আপনার ভাবনা কিসের?

—ও জজসায়েব, তা বুঝি জান না? ডাকিনী যোগিনী শাঁকচুন্নীদের বলে কত ছলা কলা, পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে দেয়। আর এই তিরির ঠাকুদ্দাটিও বড্ড হাবাগোবা, শুধু কপালগুণেই টাকা রোজগার করে, নইলে বুদ্ধি কি কিছু আছে? ছাই, ছাই। তুমি বুঝিয়ে সুজিয়ে বুড়োকে ওই ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর বাবা।

তিরি ফিসফিস করে বলল, দেখুন, ঠাকুদ্দার কিচ্ছু দোষ নেই, তিনি প্রভাবতীর সঙ্গে শুধু ভদ্র ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমার ঠাকুমাটি হচ্ছেন সেকেলে আর অত্যন্ত হিংসুটে। আপনি এঁকে বলুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।

করুণাময় বললেন, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তিরি বলল, সাত দিনের মধ্যেই।

করুণাময় বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সাত দিনের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে দেব।

তিরি বলল, ঠাকুমা, শুনলে তো? এখন বাড়ি চল, রাত্তিরে ভাল করে খেয়ো। কাল আবার আমি এঁর কাছে এসে খবর নেব। এখন তো আপনার কোর্ট বন্ধ, নয় সার? তা হলে কাল সকালে আবার দেখা করব। এখন উঠি।

পরদিন সকালে তিরি এলে করুণাময় বললেন, তুমি একটি সাংঘাতিক মেয়ে। তোমার কথায় ঠাকুমাকে তো আশ্বাস

দিলাম, কিন্তু তার পর কি করব? কাল সারা রাত আমি ঘুমুতে পারি নি। বড় বড় দেওয়ানী মামলার রায় আমি অক্লেশে দিয়েছি, ফাঁসির হুকুম দিতেও আমার বাধে নি। কিন্তু এরকম তুচ্ছ বেয়াড়া ব্যাপারে কখনও জড়িয়ে পড়ি নি। তোমার ঠাকুন্দা প্রিয়নাথবাবুকে আমি কি করে বলব — মশায়, আপনার অবুঝ গিন্নী বেচারীকে কষ্ট দেবেন না, প্রভাবতীকে হাঁকিয়ে দিন?

তিরি বলল, আপনাকে কিছুই করতে হবে না সার, শুধু সাক্ষী হয়ে থাকবেন। কাল আপনাকে এক তরফের ইতিহাস বলেছি, আজ অন্য তরফের ব্যাপারটা শুনুন।

— অন্য তরফ আবার কে? তোমার ঠাকুমা নাকি?

— আজ্ঞে হাঁ। আমি বিস্তর রিসার্চ করে যা আবিষ্কার করেছি তাই বলছি শুনুন। ঠাকুন্দা প্রিয়নাথের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে ঠাকুমা কনকলতার একটি খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, বাগবাজারের হারু মিত্তিরের ছেলে গৌরগোপাল মিত্তির, এখন যিনি অল্ডারম্যান হয়েছেন। আমার ঠাকুন্দা সুপুরুষ বটে, কিন্তু গৌরগোপাল হচ্ছেন সুপার-সুপুরুষ, মূর্তিমান কন্দর্প। তাঁর বয়স যখন উনিশ-কুড়ি তখন ঠাকুমাকে একবার লুকিয়ে দেখে-ছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই বারো বছরের নোলক-পরা বোধোদয়-পড়া খুকীর প্রেমে পড়েছিলেন। তখন ওইরকমই রেওয়াজ ছিল কিনা। তাঁর বাবা হারু মিত্তিরও মেয়েটিকে পছন্দ করলেন আর ছ হাজার টাকা পণে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হলেন। সব ঠিক, এমন সময় গৌরগোপালের আর এক সম্বন্ধ এল।

বউবাজারের বিপিন দত্তর মেয়ে, একমাত্র সন্তান, অগাধ বিষয়, সব সেই মেয়ে পাবে। হারু মিত্তির বিগড়ে গেলেন। আমার প্রপিতামহ ছিলেন অর্থগৃধ্র, কিন্তু হারু মিত্তির একবারে দুকান-কাটা চশমখোর চামচিকে, চামার পয়সা-পিশাচ। আমার ঠাকুমা কনকলতাকে তিনি নাকচ করে দিলেন, সম্পত্তির লোভে বিপিন দত্তর সেই বিশ্রী মেয়েটার সঙ্গে ছেলের বিয়ে স্থির করলেন। ছেলে গৌরগোপাল রামচন্দ্রের মতন সুবোধ, এখনকার তরুণদের মতন একগুঁয়ে নয়। কনকলতার বিরহে তিনিও দিনকতক হেমচন্দ্র আওড়ালেন—আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে। তার পর শুভদিনে ভেলভেটের ভাড়াটে ইজের-চাপকান পরে সঙ সেজে তক্তনামায় চড়ে অ্যাসিটিলীন জ্বালিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে সেই অগাধ বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী কুৎসিত মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেললেন। তার কিছু দিন পরেই ঠাকুমার সঙ্গে ঠাকুন্দার বিয়ে হল।

করুণাময় বললেন, খাসা ইতিহাস। এখন করতে চাও কি ?

—আজ বিকেলে সেই গৌরগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করব, তার পর কর্তব্য স্থির করে আপনাকে জানাব। আজকের মতন উঠি সার।

গৌ**রগোপাল** মিত্র বিকাল বেলা তাঁর প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরে প্রকাণ্ড ফরাসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানছেন আর চৈতন্যভাগবত পড়ছেন এমন সময় তিরি এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম

করে পায়ের ধুলো নিল।

গৌরগোপাল বললেন, তুমি কে দিদি? চিনতে পারছি না তো।

—আজ্ঞে, আমার নাম তিরি।

—তিরি কেন? টেক্কা কি বিবি হলেই তো মানাত।

—আমি মা-বাপের তৃতীয় সন্তান কিনা, তাই তিরি নাম। আমার ঠাকুন্দার নাম শুনেছেন বোধ হয়—সলিসিটার প্রিয়নাথ চৌধুরী, আপনারই সমবয়সী হবেন।

—ও, তুমি প্রিয়নাথ চৌধুরীর নাতনী? তাঁর সঙ্গে মৌখিক আলাপ নেই, তবে বছর চার আগে একটা মকদ্দমায় তিনি আমার বিপক্ষের অ্যাটর্নি ছিলেন। খুব ঝানু লোক।

—সে মকদ্দমায় আপনি জিতেছিলেন?

—না দিদি, হেরে গিয়েছিলুম, লাখ দুই টাকা লোকসান হয়েছিল।

—তবেই তো মুশকিল। হেরে গিয়েছিলেন তার জন্যে প্রিয়নাথ চৌধুরীর নাতনীর ওপর তো আপনার রাগ হবার কথা।

—আরে না না, তোমার ওপর রাগ করে কার সাধ্য! এখন বল তো, কি দরকার।

তিরি মাথা নীচু করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, আপনি হচ্ছেন আমার হতে-হতে-ফসকে-যাওয়া ঠাকুন্দা।

গৌরগোপাল বললেন, বুঝতে পারলুম না দিদি, খোলসা

করে বল।

— পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা স্মরণ করুন দাদু। কনকলতা বলে একটি মেয়ে ছিল, তাকে মনে পড়ে?

— কনকলতা? সে আবার কে?

তিরি বলল, সেকি দাদু, এর মধ্যেই মন থেকে মুছে ফেলেছেন? হায় রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়! বারো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, একবার দেখেই তাকে আপনি ভীষণ ভালবেসেছিলেন। তার সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধও স্থির হয়েছিল, কিন্তু শেষটায় আপনার বাবা ভেস্তে দিলেন। কিচ্ছু মনে পড়ছে না?

—হাঁ হাঁ, এখন মনে পড়েছে, নামটা কনকলতাই বটে। ওঃ, সে তো মান্ধাতার আমলের কথা, লর্ড এলগিন কি কর্জনের সময়। তা কনকলতার কি হয়েছে?

— তিনিই আমার ঠাকুমা। ঠাওর করে দেখুন তো, পঞ্চান্ন বছর আগে দেখা সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার চেহারার কিছু মিল পান কিনা। আপনি যদি অত পিতৃভক্ত না হতেন, একটু জেদ করতেন, তবে সেই কনকলতার সঙ্গেই আপনার বিয়ে হত. আপনিই আমার ঠাকুর্দা হতেন।

— ওঃ, কি চমৎকার হত! আমার কপাল মন্দ তাই তোমার ঠাকুর্দা হতে পারি নি। কিন্তু এখনই বা হতে বাধা কি? আমার তিন তিনটে নাতি আছে, অবশ্য তোমার মতন সুন্দর নয়। তাদের একটাকে বিয়ে করে ফেল না? ডাকব তাদের?

—এখন থাক দাদু। আমি বি.এ পাস করব, এম.এ পাস করব, বিলেত যাব, তার পর সংসারের চিন্তা। শেকস্পীয়ার পড়েছেন তো? আমি এখন ইন মেডেন মেডিটেশন ফ্যান্সি ফ্রী। ছ বছর পরে যদি আপনার কোনও নাতি আইবুড়ো থাকে তো আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

—জো হুকুম তিরি দেবী চৌধুরানী। কি দরকারে এসেছ তা তো বললে না?

—সেই ছোট্ট কনকলতা মেয়েটি এখন কত বড়টি হয়েছে দেখতে আপনার ইচ্ছে হয় না দাদু?

—এত দিন তো তার কথা মনেই ছিল না, তবে আজ তোমাকে দেখে তোমার ঠাকুমাকেও দেখবার একটু ইচ্ছে হচ্ছে বটে। কি লেখাই হেম বাঁড়ুজ্যে লিখে গেছেন—ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায় তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে! কিন্তু তোমার ঠাকুমা তো আমাকে চিনবেন না। আমি তাঁকে লুকিয়ে দেখেছিলুম বটে, কিন্তু তিনি আমাকে কখনও দেখেন নি।

—নাই বা দেখলেন। শুনুন দাদু—আসছে শনিবার আমার জন্মদিন, আপনাকে আমাদের বাড়ি আসতেই হবে, এখানকার ঠাকুমাকেও নিয়ে যাবেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই।

—দেখা তো হবে না দিদি। তিনি এখানে নেই, দু বছর হল স্বর্গে গেছেন। সেখানে তাঁর অনেক কাজ, ঘর দোর জিনিস-পত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবেন, চাকরদের তো বিশ্বাস করেন

না, হলই বা স্বর্গের চাকর। আমি সেখানে গিয়েই যাতে চটি জুতো, ফুলেল তেল, নাইবার গরম জল, সরু চালের ভাত, মাগুর মাছের ঝোল, চিনিপাতা দই, পানছেঁচা আর তৈরী তামাক পাই তার ব্যবস্থা করে রাখবেন।

— সতী লক্ষ্মী স্বর্গে গিয়েও ধান ভানবেন! তবে কি আর হবে, আপনি একাই আসবেন, আমি কাল নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়ে দেব।

তিরি প্রণাম করে বিদায় নিল, তার পর জস্টিস করুণাময় দত্তগুপ্ত আর ডক্টর প্রভাবতী ঘোষের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরল।

তিরির বিস্তর বন্ধু, ইরা ধীরা মীরা ঝুনু বেণু রেণু উল্লোলা কল্লোলা হিল্লোলা প্রভৃতি একটি দঙ্গল। তিরি তাদের বলেছে, জানিস, আমি ঠিক রাত বারোটায় জন্মেছিলুম, একবারে জিরো আওআর। কাজেই কোন্‌টা জন্মদিন, আগেরটা কি পরেরটা তা বলা যায় না। এখন থেকে দুটো জন্মদিন ধরব। আসছে শনিবার বিকেলে শুধু বুড়ো বুড়ীরা চা খেতে আসবে। রবিবারে তোরা সবাই আসবি, হুল্লোড় করবি, গাণ্ডে পিণ্ডে গিলবি। বুঝেছিস? বন্ধুরা সমস্বরে জবাব দিয়েছে — আসিব আসিব সখী নিশ্চয় আসি-ই-ই-ব।

*

শনিবার বিকালে প্রিয়নাথ চৌধুরীর বাড়িতে জস্টিস করুণাময়

দত্তগুপ্ত, অল্ডারম্যান গৌরগোপাল মিত্র, আর ডক্টর প্রভাবতী ঘোষ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন। বাইরের লোক আর কেউ নেই। বাড়ির লোক আছেন তিরির ঠাকুদ্দা ঠাকুমা বাবা মা আর স্বয়ং তিরি।

মাননীয় অতিথিদের সংবর্ধনা, সকলের সঙ্গে পরিচয়, আর উপহারের জন্য প্রশংসা শেষ হলে করুণাময়কে তিরি চুপিচুপি বলল, এইবারে আপনার ভাষণটি বলুন সার।

করুণাময় বললেন, কল্যাণীয়া তিরির জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই যে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, এটি একটি সামান্য পার্টি নয়। বিধাতার বিধানে যা ঘটে তা মাথা পেতে মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই, কিন্তু কেউ কেউ ভবিতব্যকে অন্য রকমে কল্পনা করতে ভালবাসে। এই ধরুন—দশরথ যদি স্ত্রৈণ না হতেন, গোসাঘরে ঢুকে কৈকেয়ীকে একটি চড় লাগাতেন, তবে রামায়ণ অন্য রকমে লেখা হত। শান্তনু যদি বুড়ো বয়সে একটা মেছুনীর প্রেমে না পড়তেন তবে ভীষ্মই কুরুরাজ হতেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও হয়তো হত না। অষ্টম এডোআর্ড যদি একগুঁয়ে না হতেন, প্রাইম মিনিস্টার আর আর্চবিশপদের ফরমাশ অনুসারে বিবাহ করতেন তবে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হত না। আমাদের এই তিরি মেয়েটি বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করে না, কিন্তু তাঁর বিধানের সঙ্গে আরও কিছু জুড়ে দিয়ে আত্মীয়ের গণ্ডি বাড়াতে চায়। সেজন্যে সে তার হলেও-হতে-পারত্তেন ঠাকুদ্দা আর ঠাকুমাকে এখানে ধরে এনেছে। তিরির আসল ঠাকুদ্দা আর ঠাকুমা

তো বাড়িতেই আছেন, তার বিকল্পিত ঠাকুন্দা শ্রদ্ধেয় অল্ডারম্যান গৌরগোপালবাবু আর বিকল্পিতা ঠাকুমা শ্রদ্ধেয়া ডক্টর প্রভাবতী ঘোষও দয়া করে এখানে এসেছেন। প্রিয়জনের এই সমাগমে তিরি যেমন ধন্য হয়েছে আমরাও তেমনি আনন্দলাভ করেছি।

কনকলতা তিরিকে জনান্তিকে বললেন, ওই বুড়ো আর বুড়ীটাকে এখানে কে আনলে রে?

তিরি বলল, গৌরগোপাল আর প্রভাবতী? আমি তো জানি না, জস্টিস দত্তগুপ্ত হয়তো বাবাকে বলে থাকবেন। ঠাকুমা, তোমার ওই ফসকে-যাওয়া বর গৌরগোপালবাবু কি সুন্দর দেখতে! আহা, ওঁর সঙ্গে তোমার যদি বিয়ে হত তা হলে বাবার রং আরও ফরসা হত, আর আমারও রূপ উথলে উঠত, একবারে ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি!

কনকলতা বললেন, দূর হ মুখপুড়ী, তোর মুখের বাঁধন কি একটুও নেই?

—কিন্তু ভাগ্যিস প্রভাবতীর সঙ্গে ঠাকুন্দার বিয়ে হয় নি, তা হলে আমার মুখটা চীনে প্যাটার্ন হত। ঠাকুমা, তোমারই জিত। পঞ্চান্ন বছর আগে ওই প্রভাবতীর একটা বর হাতছাড়া হয়েছিল, কিন্তু এত পাস করেও উনি এ পর্যন্ত আর একটা বর জোটাতে পারলেন না, অথচ তুমি একমাসের মধ্যেই জুটিয়েছিলে, যদিও বিদ্যে বোধোদয় পর্যন্ত। তুমি কিন্তু ওই গৌরগোপালবাবুর দিকে অমন করে আড়চোখে তাকিও না বাপু, ঠাকুন্দা মনে

করবেন কি ?

.কনকলতা রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কই আবার তাকাচ্ছি ! কি বজ্জাত মেয়ে তুই ! ও মাস্টার-দিদি প্রভা, এই তিরিটাকে বেত মেরে সিধে করতে পার না ? জ্বালিয়ে মারল আমাকে।

প্রভাবতী বললেন, তিরি, ঠাকুমাকে জ্বালিও না, এস আমার কাছে।

প্রভাবতী আর গৌরগোপাল পাশাপাশি বসে ছিলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁদের কাছে বসে পড়ে তিরি বলল, আর জ্বালাবার দরকার হবে না, ঠাকুমা ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। কিন্তু আসল কাজ যে এখনও বাকী রয়েছে। আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমি একটু স্বগতোক্তি করছি, যাকে বলে সলিলোকি।— প্রিয়নাথের সঙ্গে প্রভাবতীর বিয়ে হতে হতে হল না। আচ্ছা, তা না হয় না হল। গৌরগোপালের সঙ্গেও কনকলতার বিয়ে হতে হতে হল না। তাও না হয় না হল। কিন্তু প্রজাপতির নির্বন্ধে শেষটায় প্রিয়নাথের সঙ্গে কনকলতার বিয়ে হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে চিরকুমারী প্রভাবতী আর নবকুমার গৌরগোপালের কি করা উচিত ? বিধাতার ইঙ্গিত কি ?

প্রভাবতী বললেন, বিধাতার ইঙ্গিত—তোমাকে আচ্ছা করে বেত লাগানো দরকার।

গৌরগোপাল বললেন, আমার বাড়িতে পালিয়ে চল দিদি, কেউ বেত লাগাবে না।

তিরি বলল, হায় হায়, দেওয়ালের লেখা আপনাদের নজরে

পড়ছে না? প্রজাপতির নির্বন্ধ বুঝতে পারছেন না? নাঃ, আপনাদের মনে কিছুমাত্র রোমান্স নেই, দুজনে মনে প্রাণে বুড়িয়ে গেছেন, বাহ্যাভ্যন্তরে শক্ত পাথর হয়ে গেছেন, একেবারে পাকুড় স্টোন। ভাগ্যিস আপনাদের সঙ্গে ঠাকুন্দা আর ঠাকুমার বিয়ে ভেস্তে গিয়েছিল, নয়তো আমার বুড়ো ঠাকুন্দাকে বেত খেতে হত, আর বুড়ী ঠাকুমাকে বাঁদী হয়ে জন্ম জন্ম পান ছেঁচতে হত।

কনকলতা করুণাময়কে বললেন, হ্যাঁগা জজসাহেব, তিরি হাত নেড়ে ওদের কি বলছে?

—বোধ হয় ধমক দিচ্ছে।

—ছি ছি, মেয়েটার আক্কেল মোটে নেই, ভদ্রজন বাড়িতে এসেছে, তাদের ওপর তম্বি! ওর ঠাকুন্দা আশকারা দিয়ে মাথাটি খেয়েছে। তুমি ওকে খুব করে বকুনি দিও বাবা, বাড়ির লোককে তো গ্রাহ্যি করে না।

১৩৬১

শিবলাল

আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে মানিকতলা বাজারের দিকে যাচ্ছি। সিটি কলেজের কাছে এসে দেখি লোকারণ্য, দু-তিন জন লালপাগড়ি পুলিসও রয়েছে। ভিড় থেকে একটি ছেলে এগিয়ে এল। তার ব্যাজ নেই, তবু ভঙ্গী দেখে বোঝা যায় যে সে একজন স্বেচ্ছাসেবক। হাত নেড়ে আমাকে বলল, যাতায়াত বন্ধ, এই-খানে সবুর করুন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? এত ভিড় কিসের?

—দেখুন না কি হচ্ছে। শিবলাল ভার্সস লোহারাম।

কিছুই বুঝলাম না। ছেলেটি ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে অন্যত্র গেল। একজন কনস্টেবলকে দেখে বললাম, ক্যা হুআ জমাদার-জী?

দাঁত বার করে জমাদারজী বললেন, আরে কুছ নহি বাবু।

পুলিসের হাসি দুর্লভ। বুঝলাম, দুর্ঘটনা নয়, কোনও তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এত ভিড় কিসের জন্যে? যাতায়াত বন্ধ কেন? লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে কি দেখছে? কুস্তি হচ্ছে নাকি?

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক অতি কষ্টে ভিড় ভেদ করে উলটো দিক থেকে আসছেন। ছেলেরা তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে কিন্তু তিনি জোর করে চলে এলেন। আমার কাছে পে

বললাম, কি হয়েছে মশায় ?

এই সময় ভিড়ের মধ্য থেকে হাততালির শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে জন কতক ধমক দিল — চোপ, চোপ, গোল করবে না।

চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছে মশায় ?

ভদ্রলোক বললেন, হয়েছে আমার মাথা। বেলা সাড়ে চারটের মধ্যে শ্যামবাবুর বাড়িতে পোঁছুবার কথা, তা দেখুন না, ব্যাটারা পথ বন্ধ করে খামকা দেরি করিয়ে দিল।

একজন সৌম্যদর্শন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। তাঁর মাথায় টিকি, কপালে বিভূতির ত্রিপুণ্ড্রক, মুখে প্রসন্ন হাসি। আমাকে বললেন, কি হয়েছে জানতে চান ? আসুন আমার সঙ্গে। ও তিনু, ও কেষ্ট, একটু পথ করে দাও তো বাবারা।

তিনু আর কেষ্ট দুই স্বেচ্ছাসেবক কনুইএর গুঁতো দিয়ে পথ করে দিল, আমরা এগিয়ে গেলাম। সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম হরদয়াল মুখুজ্যে, এই পাড়াতেই বাস। মশায়ের নাম ?

— রামেশ্বর বসু। আমিও কাছাকাছি থাকি, বাদুড়বাগানে।

ভিড় ঠেলে আরও কিছু দূর আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে হরদয়ালবাবু আঙুল বাড়িয়ে বললেন, দেখতে পাচ্ছেন ?

দেখলাম দুটো ষাঁড় লড়াই করছে। গর্জন নেই, নড়ন চড়ন নেই, কিন্তু শীতল সমর বলা যায় না, নীরব উষ্মা দুই যোদ্ধারই বিলক্ষণ আছে। একটি ষাঁড় প্রকাণ্ড, দেখেই বোঝা যায় বয়স হয়েছে, ঝুঁটি আর শিং খুব বড়, গলা থেকে থলথলে ঝালর নেমে

প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। অন্যটি মাঝারি আকারের, বয়সে তরুণ হলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর তেজস্বী। দুই ষাঁড় শিং জড়াজড়ি করে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে পরস্পরকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করছে। টগ-অভ-ওআরের উলটো, টানাটানির বদলে ঠেলাঠেলি।

হরদয়াল বললেন, প্রায় এক ঘণ্টা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে। প্রবীণ ষাঁড়টির নাম শিবলাল, আর তরুণটির নাম লোহারাম। স্বয়ং শিব কর্তৃক লালিত সেজন্যে শিবলাল নাম। লোহারাম হচ্ছে এই পাড়ার ষাঁড়, লোহাওয়ালারা ওকে খেতে দেয়। লড়াই শুরু হতেই ওরা ওর ওপর বাজি ধরেছে। ওদের বিশ্বাস, ওই নওজওআন লোহারামের সঙ্গে বুড্ঢা শিবলাল পেরে উঠবেন না। কিন্তু পাড়ার বাঙালীরা জানে যে শেষ পর্যন্ত শিবলালেরই জয় হবে।

গান্ধী টুপি আর লম্বা কোট পরা এক ভদ্রলোক হরদয়ালের কথা শুনছিলেন। তিনি একটু ভাঙা বাংলায় বললেন, এ হরদয়ালবাবু, এর ভিতর প্রাদেশিকতা আনবেন না। এই লড়াই বিহার আর বঙ্গালের মধ্যে হচ্ছে না।

হরদয়াল বললেন, নিশ্চয়ই নয়। লোহারাম এই পাড়ার ষাঁড়, বিহারী কালোয়াররা ওকে খেতে দেয়, সেজন্যে লোহারামকে বিহারী বলা যেতে পারে। কিন্তু শিবলাল বাঙালী নন, সর্ব-ভারতীয় কস্মপলিটান ষণ্ড। এ'র জন্মভূমি কোথায় তা কেউ জানে না। তবে এ'র সম্বন্ধে আমার একটা থিওরি আছে, এ'র ইতিহাসও আমি কিছু কিছু জানি।

টুপিধারী লোকটি একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে চলে গেলেন। আমি বললাম, ইতিহাসটি বলুন না হরদয়ালবাবু।

হরদয়াল বললেন, সবুর করুন। লড়াইটা চুকে যাক, তার পর আমার বাড়িতে আসবেন, চা খাবেন, শিবলালের কথাও শুনবেন।

লড়াই শেষ হতে দেরি হল না। শিবলাল হঠাৎ একটি প্রচণ্ড গুঁতো লাগাল। লোহারাম ছিটকে সরে গেল, তার পর ল্যাজ উঁচু করে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে পালাল। দর্শকরা চিৎকার করে বলতে লাগল, শিবলালজী কি জয়! লোহারাম দূও!

প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিতাড়িত করে শিবলাল গজেন্দ্রগমনে হেলে দুলে চলল, না জানি কি জানি হয় পরিণাম দেখবার জন্যে আমরাও তার পিছু নিলাম। একটা বাঙালী ময়রার দোকানের সামনে পিতলের থালায় শিঙাড়া আর নিমকি সাজানো রয়েছে। শিবলাল তাতে মুখ দিল। ত্রস্ত হয়ে ময়রা হাঁ হাঁ করে উঠল। দর্শকেরা ধমক দিয়ে বলল, খবরদার, বাধা দিও না, পেট ভরে খেতে দাও, তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে এমন অতিথি পেয়েছ। দু থালা নিঃশেষ করে শিবলাল এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে একজন ভলণ্টিয়ার তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, এগিয়ে এস বাবা।

পাশেই একটি হিন্দুস্থানী হালুইকরের দোকান। সামনের বারকোশে সদ্য ভাজা দালপুরির স্তূপ দেখিয়ে ভলণ্টিয়ার বলল, যত খুশি খাও বাবা। আপত্তি নিষ্ফল জেনে হালুইকর চুপ করে

রইল। অচিরাৎ দালপুরি শেষ হল। একটি ছেলে দোকানের ভিতরে ঢুকে ছোলার দাল, আলুর দম, আর জিলিপির গামলা টেনে এনে সামনে রাখল। শিবলাল সমস্ত উদরস্থ করে ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করতে লাগল। দর্শকরা বলল, আর কি আছে জলদি নিকালো। দোকানদার বিষণ্ণ মুখে বলল, কুছ ভি নহি, সব খা ডালা।

হরদয়ালবাবু হাতে একটু জল নিয়ে শিবলালের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, নমঃ শিবায়। শিবলাল ফোঁস ফোঁস শব্দ করে বিবেকানন্দ রোডের দিকে চলে গেল।

হরদয়ালবাবুর বাড়ি কাছেই। কৌতূহলের বসে আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। বাইরের ঘরে ফরাসের উপর আমাকে বসিয়ে হরদয়াল চাকরকে হুকুম করলেন, ওরে, জলদি এঁর জন্যে চা তৈরি করে আন।

আমি বললাম, আপনি ব্যস্ত হবেন না, এ সময় চা খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। শুধু শিবলালের ইতিহাস শুনব। আপনার কি একটি থিওরি আছে বলছিলেন, তাও শুনতে চাই।

হরদয়াল বললেন, সবই বলব। চা খাবেন না তো একটু শরবত আনতে বলি? খুব মাইল্ড সিদ্ধির শরবত? বৃদ্ধ বয়সে একটু খাওয়া ভাল। তাও নয়? সিগারেট?

—ওসব কিছুই দরকার নেই। আপনি শিবলালের কথা বলুন।

—বেশ, তাই বলছি শুনুন। এই যে শিবলালজীকে দেখেছেন, এঁকে সামান্য ষাঁড় মনে করবেন না। মাদাম ব্লাভাৎস্কি বলেছেন, মানবের চাইতেও যেমন বড় আছেন মহামানব বা সুপারম্যান, তেমনি পশুর ওপর আছেন মহাপশু, সুপারবীস্ট। হিমালয়বাসী স্নোম্যান হচ্ছেন সেইরকম প্রাণী। এঁদের বড় একটা দেখা যায় না, কালে ভদ্রে লোকালয়ে আগমন করেন। এই শিবলাল হচ্ছেন একজন সুপারবীস্ট। মহোক্ষ জানেন? সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক উল্লেখ আছে। মহোক্ষ মানে মহাষণ্ড, উক্ষ আর ইংরিজী অক্স একই শব্দ। শিবলালের প্রথম আবির্ভাব কোথায় হয়েছিল, বর্তমান বয়স কত, তা কেউ জানে না। আমার পিতামহ ওঁকে কাশীতে দেখেছিলেন। আবার তাঁর পিতামহ ওঁকে হরিদ্বারে দেখেছিলেন। তবেই বুঝুন ওঁর বয়সটা কত। আর, চেহারাটি দেখুন, আমাদের বাংলা ষাঁড় কিংবা ভাগলপুর সীতামাড়ি বা হিসারের ষাঁড়, কারও সঙ্গে মিল নেই। মহেঞ্জোদারো আর হরাপ্পায় যেসব পোড়া মাটির সীল পাওয়া গেছে তার ছবি দেখেছেন তো? তাতে যে মহাষণ্ডের মূর্তি আছে তার সঙ্গে এই শিবলালের রূপ মিলিয়ে দেখুন। সেই বিশাল বপু, সেই উন্নত ককুদ, সেই বৃহৎ শৃঙ্গ, সেই ভূলুণ্ঠিত গলকম্বল। প্রাচীন সৈন্ধব জাতি অর্থাৎ ইন্ডস ভ্যালির লোকরা শৈব ছিলেন। তাঁদের উপাস্য দেবতা শিবের বাহন যে মহোক্ষ, তাঁরই মূর্তি পোড়া মাটির মুদ্রায় অঙ্কিত আছে। আমার থিওরিটা কি জানেন? এই শিবলালজীই হচ্ছেন পুরাকালীন সৈন্ধব জাতির মহোক্ষ,

এখন পর্যন্ত ধরাধামে আছেন। এতটা যদি বিশ্বাস নাও করেন তবে এ কথা মানতে বাধা নেই যে শিবলাল সেই সৈন্ধব মহোক্ষেরই বংশধর। কি বলেন আপনি ?

— অসম্ভব নয়।

— আচ্ছা, এখন এঁর কীর্তিকলাপ শুনুন। চার বছর আগে ইনি কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দিরের নিকটে বিচরণ করতেন। একদিন ভোরবেলা মন্দিরের দরজার সামনে নিদ্রিত ছিলেন, একজন পাণ্ডা এঁকে ঠেলা দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করে। যখন কিছুতেই উঠলেন না তখন পাণ্ডা লাথি মারতে লাগল। শিবলাল ক্রুদ্ধ হয়ে শিং দিয়ে পাণ্ডার পেট ফুটো করে দিলেন। তার পর থেকে কাশীধামে ওঁকে আর দেখা গেল না। মাস দুই পরে উনি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বৈদ্যনাথের মন্দিরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল, ঝাঁঝার জঙ্গলে একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মৃত দেহ পাওয়া গেছে, কোনও মহাকায় প্রাণী শিঙের গুঁতোয় তার পেট ফুটো করেছে, পা দিয়ে মাড়িয়ে সর্বাঙ্গ চূর্ণ করে দিয়েছে। এই শিবলালজীরই কর্ম তাতে সন্দেহ নেই। পাণ্ডাদের পরিচর্যায় ওঁর ঘা শীঘ্রই সেরে গেল। কিন্তু কি একটা অসম্মানের জন্যে বিরক্ত হয়ে উনি বৈদ্যনাথধাম ত্যাগ করলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে তারকেশ্বরে এলেন। আবার দিন কতক পরে সেখান থেকে চুঁচড়োর ষাঁড়েশ্বরতলায় উপস্থিত হলেন। প্রায় তিন বছর হল সেখান থেকে কালীঘাটে এসে নকুলেশ্বর মন্দিরের কাছে আস্তানা করেছেন। আজকাল সেখানেই রাত্রিযাপন করেন, দিনের

বেলায় শহরের নানা স্থানে পর্যটন করে বেড়ান।

আমি বললাম, চমৎকার ইতিহাস। আচ্ছা, বসুন আপনি, আমি এখন উঠি।

হরদয়ালবাবু হাত নেড়ে বললেন, আরে এখনই উঠবেন কি? শিবলালজীর যা শ্রেষ্ঠ কীর্তি, মহত্তম অবদান, তাই বাকী রয়েছে। বলছি শুনুন। কামধেনু ডেয়ারি ফার্মের নাম শুনেছেন?

—আজ্ঞে হাঁ। সেখান থেকেই তো আমার বাড়িতে দুধ আসত। শেষ কালে ওদের কুবুদ্ধি হল, মোষের দুধ, গুঁড়ো দুধ, জল, এইসব মিশিয়ে খদ্দের ঠকাতে লাগল। তখন তাদের দুধ নেওয়া বন্ধ করলাম।

—প্রায় দু বছর হল কামধেনু ডেয়ারি ফেল হয়েছে। কেন ফেল হল জানেন? ওই বাবা শিবলালের কোপে পড়ে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কামধেনু ডেয়ারির তিন শ গরু ছিল, ঢাকুরের ওদিকে বড় বড় গোয়ালে তারা থাকত। সকালে দুধ দোহার পর আট-দশ জন রাখাল তাদের গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। দিন ভর তারা ঘাস খেত, তার পর বেলা পড়লে রাখালরা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

সেই সময় শিবলাল চুঁচড়ো থেকে কালীঘাটে আগমন করেন। উনি সমস্ত দিন টোটো করে ঘুরতেন, সন্ধ্যের কিছু আগে গড়ের মাঠে গিয়ে খানিকক্ষণ নিরিবিলিতে বায়ুসেবন করতেন। একদিন কি খেয়াল হল, বেলা তিনটের সময় মাঠে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, এক পাল নধর গরু চরে বেড়াচ্ছে। শিবলাল প্রীত হয়ে

নাসিকা উত্তোলন করে কয়েকবার হর্ষসূচক ঘোঁত ঘোঁত ধ্বনি করলেন। আর যায় কোথা! সেই আহ্বান শুনে কামধেনু ডেয়ারির তিন শ গরু হাম্বা রব করে ছুটে এসে শিবলালকে বেষ্টন করল। রাসমণ্ডলের মধ্যবর্তী গোপিকাবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শিবলাল শোভমান হলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি মাঠ ত্যাগ করে সবেগে চললেন, সমস্ত গরু অভিসারিকা হয়ে তাঁর অনুসরণ করল। হেস্টিংস ছাড়িয়ে ডায়মণ্ড হারবার রোড দিয়ে শিবলালের অনুগামিনী ধেনুবাহিনী মার্চ করে চলল, রাখালরা লাঠি নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু তিন শ গরু যদি স্বেচ্ছায় একটি ষাঁড়ের সঙ্গে ইলোপ করে তবে তাদের আটকাবে কে? বেগতিক দেখে কয়েক জন রাখাল ফিরে গিয়ে কর্তাদের খবর দিল। তখন তিন জন ডিরেক্টর—গোবরচন্দ্র ঘোষ, গোর্ধনলাল মাথুর, আর হাজী কোরবান আলী মোটরে চড়ে ছুটলেন, একটা লরিতে তাঁদের অনুচররাও চলল। মগরাহাটের কাছাকাছি এসে দেখলেন, একটি মাঠে শিবলালজী তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে ঘাস খাচ্ছেন। কর্তারা স্থির করলেন, ওই ষাঁড়টিকে কাবু না করলে তাঁদের গোধন উদ্ধার করা যাবে না। তাঁদের হুকুমে জনকতক সাহসী লোক লাঠি নিয়ে শিবলালজীকে আক্রমণ করল। তখন সমস্ত গরু একযোগে শিং বাগিয়ে তেড়ে এল, ডেয়ারির লোকরা ভয় পেয়ে পালাল। কর্তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন, কয়েকজন রাখাল গরুদের ওপর নজর রাখবার জন্যে সেখানে রয়ে গেল।

তার পর ডেয়ারির কর্তারা আরও তিন-চার দিন গরু ফিরিয়ে

আনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। শেষ কালে স্থির করলেন যে মগরাহাটের ওই মাঠটা লীজ নিয়ে ওখানেই ডেয়ারির জন্য গোশালা করবেন। ভেজাল দুধ দিয়ে কোনও রকমে খদ্দের ঠেকিয়ে রাখা হল, ওদিকে জমির মালিকের সঙ্গেও কথাবার্তা চলতে লাগল। তখন আর এক বিপদ উপস্থিত। শিবলালজী মুক্ত জীব, বেশী দিন সংসার মায়ায় বদ্ধ হয়ে থাকতে পারবেন কেন? সাত দিন পরেই তাঁর গোষ্ঠলীলার শখ মিটে গেল, রাত্রিযোগে তিনি একাকী কালীঘাটে প্রত্যাবর্তন করলেন।

—গরুগুলোর কি হল? কর্তারা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তো?

—রাম বল, ফেরাবার জো কি? চার দিকের গাঁ থেকে চাষারা এসে সব গরু লুট করে নিয়ে গেল।...দেখুন রামেশ্বরবাবু, এই শিবলালজীর মাহাত্ম্য দেশের লোক এখনও বুঝল না। আমি দুগ্ধ-মন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলাম—মশায়, ওঁকে হরিণঘাটায় নিয়ে গিয়ে তোয়াজ করুন, আপনাদের গোবংশের অশেষ উন্নতি হবে। এমন পেডিগ্রি-সম্পন্ন মহাকুলীন ষাঁড় আর পাবেন কোথা? কিন্তু মন্ত্রীমশায় কিছুই করলেন না, তিনি শুধু সীতামাড়ি, হরিয়ানা, হিসার, শর্ট হর্ন, জার্সি—এই সব বোঝেন। আচ্ছা, আজ এখন উঠতে চান? মধ্যে মধ্যে আসবেন দয়া করে, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় খুশী হলাম রামেশ্বরবাবু। নমস্কার।

১৩৬১

নীলকণ্ঠ

লেকের ধারে তিন বার চক্কর দিয়েছি, সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়িমুখো হব এমন সময় কাতর কণ্ঠস্বর কানে এল — ও মশায়, দয়া করে আমার কাছে একটু বসুন না।

ভদ্রলোক একটা বেঞ্চে একা বসে আছেন। রোগা চেহারা, চুল উস্ক খুস্ক, দাড়িও সম্প্রতি কামান নি। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। মুখ দেখে মনে হল শারীরিক বা মানসিক কষ্ট ভোগ করছেন। আমি তাঁর পাশে বসতেই বললেন, আপনার নাম আর ঠিকানা?

আর কেউ হঠাৎ এমন প্রশ্ন করলে ধমক দিতাম, কিন্তু এঁর উপর রাগ হল না। বললাম, আমার নাম সুশীলচন্দ্র চন্দ্র, কাছেই থাকি, একুশ নম্বর কার্তিক নশকর লেন। কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক নোটবুক বার করে একটা পাতা ছিঁড়ে খচখচ করে কিছু লিখলেন। তার পর কাগজটি মুড়ে আমাকে বললেন, ধরুন, পকেটে রেখে দিন, হারাবেন না যেন।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কাগজ নিয়ে আমি কি করব? আপনার নাম কি মশায়?

— আমার নাম শ্রীনীলকণ্ঠ তবলদার, হাল ঠিকানা প্লট নম্বর পঞ্চান্ন, কপিল রোড এক্সটেনশন, ডাক্তার বঙ্কিম পালের বাড়ি।

কাগজটা যত্ন করে রাখবেন, আপনি যাতে বিপদে না পড়েন তার জন্যে লিখে দিয়েছি।

— বিপদে পড়ব কেন ?

— পুলিস আপনাকে নিয়ে টানাটানি করতে পারে তাই লিখে দিয়েছি — আমার মৃত্যুর জন্যে আমি ভিন্ন আর কেউ দায়ী নয়।

— আপনারই বা মৃত্যু হবে কেন ?

নীলকণ্ঠ তবলদার চক্ষু বিস্ফারিত করে বিকৃতমুখে একটু হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ? তবে এই দেখুন।... বলেই পকেট থেকে একটা শিশি বার করে ঢকঢক করে সবটা খেয়ে ফেললেন।

লোকটির কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, একি করলেন ! আমি লোক ডাকছি —

নীলকণ্ঠ বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরলেন এবং পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে বললেন, খবরদার উঠবেন না বলছি, তা হলে আমার টুঁটি কেটে ফেলব।

বদ্ধ পাগল। একে বাঁচানো যাবে কি করে ? কাছাকাছি কেউ নেই, দূরে কয়েক জন বেড়াচ্ছে। চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছি, নীলকণ্ঠ আমার মুখ চেপে ধরে বললেন, খবরদার, টুঁ শব্দটি করলেই আমি নিজেকে জবাই করব।

বললাম, আপনার মতলবটা কি মশায় ? একাই তো মরতে পারতেন, আমাকে ডাকবার কি দরকার ছিল ?

নীলকণ্ঠ একটু নরম হয়ে বললেন, রাগ করবেন না সুশীল-

বাবু। অন্তিম মুহূর্তে আমার ইতিহাসটি আপনাকে শোনাতে চাই, নইলে মরেও শান্তি পাব না।

— আপনি তো এখনই মরবেন, ইতিহাস শোনাবেন কখন?

নীলকণ্ঠ তাঁর হাতঘাড় দেখে বললেন, এখন সওয়া ছটা, সাড়ে ছটা পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে। পনরো মিনিট পরে মরব।

— কি খেয়েছেন?

— হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড। শিশিটা শুঁখে দেখুন, বাদামের গন্ধ পাবেন।

— ও জিনিস খেলে তো সংগে সংগে মরবার কথা। এখনও বেঁচে আছেন কি করে?

— হুঁ হুঁ, এটি আমারই আবিষ্কার দাদা। ফোটোগ্রাফি করেছেন কখনও? এক্সপোজ করে দোকানে ফিল্ম দিলেন, সব কাজ তারাই করে দিল, সে রকম ফাঁকির ফোটোগ্রাফি নয়। নিজে ডেভেলপ করেছেন কখনও? পটাশ ব্রোমাইডে কি হয় জানেন? রিটার্ডেশন হয়, ছবি ফুটে উঠতে দেরি হয়। যা খেয়েছি তাতে টু পারসেণ্ট হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড আর তিন গ্রেন ব্রোমাইড আছে, তার ফলে বিষক্রিয়া পিছিয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন না? সিদ্ধির সংগে মাকড়শার ঝুল মিশিয়ে খেলে জোর নেশা হয় জানেন তো? একে বলে সিনারজিস্টিক এফেক্ট। কিন্তু ঝুলের বদলে যদি ইঁদুর-নাদি মেশান তবে নেশা ধরতে দেরি হবে, কারণ ইঁদুর-নাদি হল অ্যান্টি-সিনারজিস্টিক। পটাশ ব্রোমাইডের ক্রিয়াও সেই রকম। পাস করি নি বটে, কিন্তু বাড়িতে বিস্তর

পড়েছি, হেন সায়েন্স নেই যা জানি না। আমার বন্ধু বঙ্কিম পাল তার ডিসপেনসারিতে আমারই প্রিস্‌ক্রিপ্‌শন মাফিক মিক্‌শ্চার বানিয়ে দিয়েছে।

—বন্ধু হয়ে আপনাকে বিষ দিলেন ?

—তা না দেবে কেন। আমার প্রাণ আমার নিজের সম্পত্তি, নির্ব্যূঢ় স্বত্বে ভোগ দখল করতে পারি, যেমন খুশি দান বিক্রয় বা ধ্বংসের অধিকারও আমার আছে। আপনাদের আইন আমি গ্রাহ্য করি না। বঙ্কিম ডাক্তারও উদার লোক, তার প্রেজুডিস মোটেই নেই। সে তার বন্ধুর অন্তিম অনুরোধ পালন করেছে।

—শুধু শুধু মরছেন কেন ?

—শুধু শুধু নয় মশায়। এই পৃথিবীর ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, কেবল ভেজাল নকল ঠকামি আর জোচ্চুরি। এই সামনের দুটো দাঁত দেখুন, কাঁকর মিশনো চাল খেয়ে ভেঙে গেছে। পাঁচটি বচ্ছর ড্রপসিতে ভুগেছি, ভেজাল সরষের তেল খেয়ে। দু বছর ধরে সর্দিতে ভুগছি, মুরগির মাংস বলে ব্যাটারা কচ্ছপ খাইয়েছে। তেল ঘি দুধ দই মসলা সর্বত্র ভেজাল। কংগ্রেস সরকারও ভেজাল, সর্বত্যাগী গান্ধীজীর নাম করে সমস্ত ক্ষমতা হাতিয়েছে আর মোটা মোটা মাইনে দিয়ে এক পাল খাঞ্জা খাঁ নবাব পুষছে। কমিউনিস্ট পার্টিও ভেজাল, দেশ সুদ্ধ লোককে ভেড়া বানিয়ে ডিক্‌টেটারি চালাবার মতলব। অধিক কি বলব মশায়, বিবাহে পর্যন্ত ভেজাল। আর সব কোনও রকমে সইতে পারি, কিন্তু ভেজাল বউ অসহ্য।

—ভেজাল বউ কি রকম? কালো মেয়ে রং মেখে আপনাকে ঠকিয়েছে নাকি?

—আরে না মশায়, কালোতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি নিজেই বা কোন্ ফরসা।

—কুলকন্যা সেজে কুলটা আপনার ঘরে এসেছে?

—তা হলে তো উপায় ছিল, শুদ্ধি অর্থাৎ ডিস্‌ইনফেক্ট করিয়ে নিয়ে সংসারধর্ম করতাম। বলছি শুনুন। আমি ছেলে-বেলা থেকেই প্রবাসী। বাবা ডোংগরগড়ে কাঠের কারবার করতেন, তিনি গত হবার পর আমিও তা করছি। বন্ধুরা বলল, ওহে নীলকণ্ঠ, বুড়ো হতে চললে, এইবারে একটি বউ আন। কথাটা মনে লাগল, তাই বিবাহ করবার জন্যে কলকাতায় এলাম। বঙ্কিম ডাক্তার আমার বাল্যবন্ধু, সে ছাড়া কলকাতায় আমার চেনা লোক নেই। তার বাড়িতেই আছি। হঠাৎ একদিন হেবো এসে উপস্থিত। তাকে আগে কখনও দেখি নি, পরিচয় দিল—সে আমার দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। খুব চালাক ছোকরা। আমাকে বলল, শুনুন দাদা, শহুরে মেয়েরা রাবিশ, আমাদের গ্রামে চলুন, খুব ভাল পাত্রী আমার সন্ধানে আছে। হেবোর সঙ্গে চালতাডাঙায় গেলাম, খরচের জন্যে তিন শ টাকাও তাকে দিলাম। পাত্রীটি দেখলাম নেহাত মন্দ নয়। নম নম করে বিবাহ হয়ে গেল। তার পর ফুলশয্যার রাত্রে একলা পেয়ে কনে আমাকে কি বলল জানেন?—ও মোসাই, দুটো সিগ্রেট দিন তো, সমস্ত দিন না খেয়ে ভোচকানি লেগেছে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চাইতেই

বলল, ঘাবড়াও কেন প্রাণনাথ ? ক্যায়সা বউ পেয়েছ দেখ না ঠাওর করে। আমার চাঁদমুখে একবার হাতটি বুলিয়ে দেখ, দু নম্বর সিরিশ কাগজের মতন ঠেকছে না ? দু দিন পরে দেখবে ইয়া মোচ ইয়া দাড়ি।

—পুরুষের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছিল নাকি ?

—হাঁ মশায়। আমি বিয়ে পাগলা নই, এমন কিছু বুড়োও হই নি, তবু আমাকে ঠকিয়েছিল। পরদিন হেবোকে গালাগাল দিতেই সে বলল, কি সর্বনাশ, দেশের লোককে বিশ্বাস করবার জো নেই। ওই বজ্জাত নিমাই মিত্তিরটার এই কাজ, নিজের শালীপো মটরাকে কনে সাজিয়ে ঠকিয়েছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দাদা, নিমে শালাকে আমি দেখে নেব। যা হবার হয়ে গেছে, এখন মটরাকে গোটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বিদেয় করুন, নইলে আদালতে গিয়ে খোরপোশের দাবি করবে।

আমি বললাম, খুব করুণ ইতিহাস নীলকণ্ঠবাবু। কিন্তু পনরো মিনিট কাবার হতে চলল, এখনও তো আপনি মরলেন না।

—আঃ ব্যস্ত হন কেন। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, মরণের অবধারিত কাল নাই। বিষ খেলেই যে বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে মরতে হবে এমন কোনও নিয়ম নেই, মানুষের ধাত অনুসারে কিছু এদিক ওদিক হয়। আচ্ছা, আমার নাড়ীটা একবার দেখুন তো, বড্ড যেন কাহিল ঠেকছে।

নাড়ী দেখে আমি বললাম, দিব্যি সুস্থ সবল লোকের নাড়ী,

ক্ষীণে বলবতী প্রাণঘাতিকা নয়। আপনি এখনই মরবেন না নীলকণ্ঠবাবু, অনর্থক আমাকে আটকে রেখেছেন। আমি এখন উঠি—

—আপনি তো ভারী স্বার্থপর লোক মশায়! একটা মানুষ মরতে বসেছে, তার শেষ অনুরোধ রাখবেন না? পনরো মিনিটের জায়গায় না হয় বিশ কি পঁচিশ মিনিটই হল। যা বলছিলাম শুনুন। হেবো আমাকে বলল, আবার আপনার বিয়ে দেব দাদা, আমাদের ভজু-মামাকে লাগিয়ে দেব, তুখড় লোক, তাকে কেউ ঠকাতে পারবে না। আপনি এখন কলকাতায় ফিরে যান, ভজু-মামা পাত্রী স্থির করেই আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

—তবে আপনি মরতে চান কেন? বিবাহ তো হবেই।

—আর বিশ্বাস করি না মশায়, এখন ইহলোক থেকে চলে যাওয়াই ভাল মনে করি।

—কোথায় যেতে চান, স্বর্গে?

—রাম বল, স্বর্গেও ভেজাল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র বরুণ সব পালিয়েছেন, এখানকার অবতাররা সেখানে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। আমি মঙ্গল গ্রহে যাব স্থির করেছি। পরশু শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলাম—

আমি উঠে পড়ে বললাম, মাপ করবেন নীলকণ্ঠবাবু, আমাকে এখন যেতেই হবে। আপনার মৃত্যুর ঢের দেরি, বহু বৎসর বাঁচবেন। আপনার বন্ধু বঙ্কিম ডাক্তার আপনাকে ঠকিয়েছেন। আচ্ছা, বসুন, নমস্কার।

নীলকণ্ঠবাবু আমাকে ফেরাবার জন্যে চিৎকার করতে লাগলেন কিন্তু আমি আর দাঁড়ালাম না।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, আহা, পাগল লোকটিকে একলা ফেলে এসেছি, আজ একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। ডাক্তার বঙ্কিম পালকে চিনি, বেলা নটার সময় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

নীলকণ্ঠবাবু নীচের বারান্দায় বসে সিগারেট টানছেন। আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আসুন আসুন সুশীলবাবু। দেখুন, জগতে আপনিই একমাত্র খাঁটী মানুষ, আমার বন্ধু বঙ্কিম ডাক্তারও ভেজাল চালিয়েছে, হাইড্রোসায়ানিকের বদলে বাদামের শরবত খাইয়েছে। নেহাত বন্ধু লোক, নইলে পুলিসে খবর দিতাম।

আমি বললাম, বঙ্কিম ডাক্তার খুব ভাল কাজ করেছেন, তিনি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাই আপনার বেয়াড়া অনুরোধ রাখেন নি।

এই সময় একটি লোক এসে বলল, নীলকণ্ঠ তবলদার এখানে থাকতেন ?

নীলকণ্ঠ বললেন, আপনি কে মশায় ?

—আমি সম্পর্কে নীলকণ্ঠর মামা হই, ভজু-মামা, চালতা-ডাঙার হেবো আমাকে পাঠিয়েছে।

নীলকণ্ঠ ভয় পেয়ে চুপি চুপি আমাকে বললেন, আপনিই

কথা বলুন দাদা, আমি আর ওদের ফাঁদে পা দিচ্ছি না।

আমি প্রশ্ন করলাম, কি দরকার আপনার?

—বড়ই দুঃসংবাদ, নীলকণ্ঠ বেচারা মারা গেছে।

আমরা দুজনেই চমকে উঠে বললাম, অ্যাঁ, বলেন কি!

—হাঁ মশায়। কাল সন্ধ্যেয় কলকাতায় পেঁাছেই সোজা এখানে এসেছিলাম, একটা ভাল সম্বন্ধ পেয়েছি কিনা। এসে দেখি, নীলকণ্ঠ নেই, ডাক্তারবাবুও বেরিয়ে গেছেন। একটি ছোকরা কম্পাউন্ডার বলল, নীলকণ্ঠবাবু চার আউন্স বিষ নিয়ে লেকে গেছেন, তাঁর মতলব ভাল নয়, যান যান, এখনই সেখানে গিয়ে খবর নিন। গিয়ে শুনলাম, লেকের ধারে একটা লাশ পাওয়া গেছে, পুলিস মর্গে চালান দিয়েছে।

আমি বললাম, লেকে তো প্রায়ই লাশ পাওয়া যায়, ও জায়গাটা হচ্ছে হতাশ প্রেমের ভাগাড়। নীলকণ্ঠবাবু কি দুঃখে মরবেন?

ভজু-মামা বললেন, না মশায়, আপনি জানেন না, নির্ঘাত নীলকণ্ঠ। বেচারা বিয়ে করে হতাশ হয়েছে কিনা। আমি তখনই ছুটে মর্গে গেলাম, কিন্তু ঢুকতে পেলাম না। বলল, এখন ঘর বন্ধ, কাল সকালে এসো। আজ সকালে আবার সেখানে গেলাম। সারি সারি সব শুয়ে আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের নীলকণ্ঠ। হেবোর কাছে তার চেহারার যেমন বর্ণনা শুনেছি হুবহু মিলে গেল।

নীলকণ্ঠ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এখন আতঙ্কিত হয়ে বললেন, বয়স কত?

— তা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

— বলেন কি! রং ফরসা না ময়লা?

— ময়লাই বটে।

— তবেই তো সর্বনাশ! গায়ে কোট না পঞ্জাবি?

— পঞ্জাবি। ধুতির ওপর আজকাল কেউ কোট পরে না মশায়, পশ্চিমে বাঙালী ছাড়া।

— গোঁফ আছে না নেই? পায়ে কি রকম জুতো?

— গোঁফ আছে বই কি। পায়ে কাবুলী জুতো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীলকণ্ঠ বললেন, তবে সে লাশ আমার নয়। আমি পঞ্জাবি পরি না, গোঁফ রাখি না, কাবুলী জুতোও আমার নেই। যাক, বাঁচা গেল। মরবার মতলবটা এখন ছেড়ে দিয়েছি।

আমি বললাম, ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন নীলকণ্ঠ-বাবু।

ভজু-মামা বললেন, আরে তুমিই আমাদের নীলকণ্ঠ? এতক্ষণ বলতে হয়! আশ্চর্য, রাখে কৃষ্ণ মারে কে। আজকেই কালীঘাটে একটা পুজো দিতে হবে বাবা, দাও তো পাঁচটা টাকা। তোমার জন্যে আমি একটি চমৎকার সম্বন্ধ এনেছি নীলু, একবারে ডানাকাটা পরী।

সম্বন্ধের কথা শুনেই নীলকণ্ঠ ভয় পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে দোতলায় চলে গেলেন। ভজু-মামা বললেন, পালিয়ে গেল কেন?

আমি উত্তর দিলাম, নীলকণ্ঠবাবুর বিবাহে অরুচি হয়ে গেছে। ওঁর শরীর আর মন ভাল নেই, আপনি ওঁকে বিরক্ত করবেন না, চলে যান।

—আপনি আমাকে তাড়াবার কে মশায়? নীলু আমার ভাগনে, ওর কিসে ভাল হয় তা আমি বুঝব। আপনি এর মধ্যে আসেন কেন? ডেকে আনুন নীলুকে।

এই সময় বঙ্কিম ডাক্তার ওপর থেকে নেমে এলেন। ভজুকে বললেন, আবার কি করতে এসেছ হে?

—আমার ভাগনে নীলকণ্ঠকে এখনি ডেকে দিন।

—তার সঙ্গে দেখা হবে না। দূর হও এখান থেকে।

—আপনি বললেই দূর হব? আগে নীলকণ্ঠ আসুক, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। এখানে পরের বাড়িতে কেন সে থাকবে?

—সুশীলবাবু, দেখবেন এই লোকটা যেন না পালায়, আমি পুলিসে টেলিফোন করছি। ওরে ফটকটা বন্ধ করে দে।

ফটক বন্ধ হবার আগেই ভজু-মামা নক্ষত্র বেগে সরে পড়লেন।

১৩৬১

জয়হরির জেব্রা

এই আখ্যানের নায়ক জয়হরি হাজরা, নায়িকা বেতসী চাকলাদার, উপনায়ক উপনায়িকা গুটিকতক জন্তু, যথা— একটি বিলাতী কুত্তা, একটি দেশী কুত্তী, একটি আরবী ঘোড়া এবং একটি ভারতীয় জেব্রা। লেডিজ ফার্স্ট — এই আধুনিক নীতি অনুসারে প্রথমে বেতসীর পরিচয় দেব, তার পর জয়হরির কথা বলব। জন্তুদের অবতারণা যথাস্থানে করলে চলবে।

বেতসী বিলাতে জন্মেছিল, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পাঁচ বৎসর পরে। তার বাপ মা ব্রিটিশভক্ত ছিলেন, সেজন্য মেয়ের নাম এলিজাবেথ রেখেছিলেন, সংক্ষেপে বেট্‌সি। কিন্তু সে নাম পরে বদলানো হয়। ভারতবর্ষে ফেরবার সময় জাহাজে একজন ইংরেজ স্ত্রীলোক বেট্‌সির মাকে ডার্টি নিগার বলেছিল, তাতেই রেগে গিয়ে তিনি তখনই মেয়ের বেট্‌সি নাম বদলে বেতসী করলেন।

বেতসীর বাবা প্রতাপ চাকলাদার ধনীর সন্তান। এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে সস্ত্রীক বিলাত গিয়েছিলে —
পাঁচ-ছ বৎসর বাস করে কৃষি ও পশুপালন
এসে উলুবেড়ের কাছে তাঁর পৈতৃক জমি
শ বিঘা জমির উপর ফুল ফল ফু

টমাটো ইত্যাদির বাগান এবং বিস্তর গরু রেখে ডেয়ারি ফার্ম করলেন, তা ছাড়া ভেড়া ছাগল শুয়োর মুরগি হাঁস পুষে তারও ব্যবসা চালাতে লাগলেন। একটি উত্তম বাগানবাড়ি বানিয়ে সপরিবারে সেখানেই বাস করতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন। সতরো বৎসর ধরে ব্যবসা ভালই চলল, লাভও প্রচুর হতে লাগল। তার পর প্রতাপ চাকলাদার মারা গেলেন।

বেতসীর মা অতসী মুশকিলে পড়লেন। স্বামীর হাতে গড়া অত বড় ব্যবসাটি চালাবার ভার কাকে দেবেন? তাঁর ছেলে নেই, একমাত্র সন্তান বেতসী। নায়েব হরকালী মাইতি কাজের লোক বটে, কিন্তু অত্যন্ত বুড়ো হয়েছেন, তাঁর উপর নির্ভর করা চলে না। স্থির করলেন সব বেচে দিয়ে কলকাতায় চলে যাবেন। কিন্তু বেতসী বলল, কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি চালাব, বাবার কাছে সব শিখেছি। অতসী ভরসা পেলেন না, তবু মেয়ের জেদ দেখে ভাবলেন, দু বছর দেখাই যাক না, তার পর না হয় বেচে ফেলা যাবে। একটি উপযুক্ত জামাই যদি পাওয়া যায় তবে আর কোনও ভাবনা থাকে না। কিন্তু মেয়েটা যে বেয়াড়া, এত বয়েসেও তার কাণ্ডজ্ঞান হল না।

অতসী উঠে পড়ে জামাইএর খোঁজ করতে লাগলেন। মেয়েকে নি[illegible] লকাতায় গেলেন, পার্টি দিলেন, বহু পরিবারের [illegible] বাছা পাত্রদের হোগলবেড়েতে নিমন্ত্রণ করে [illegible]ফল হল না। প্রতাপ চাকলাদারের [illegible] আর কুপাত্র এগিয়ে এসেছিল,

কিন্তু বেতসীর সঙ্গে দু দিন মেশার পরেই সরে পড়ল। তার গড়ন ভাল, রং খুব ফরসা, কিন্তু মুখে লাবণ্যের একটু অভাব আছে। সে মেমের মতন ব্রীচেস পরে ঘোড়ায় চড়ে তার তিন শ বিঘা ফার্ম পরিদর্শন করে, কর্মচারীদের উপর হুকুম চালায়, শাসনও করে। তার রূপ চিত্তাকর্ষক নয়, মেজাজও উগ্র, সেজন্য তার মায়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। বেতসী বলল, তোমার জামাই না জুটল তো বড় বয়েই গেল, আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না, বাবার ফার্ম একাই চালাব। কিন্তু অতসী দেখলেন, ফার্মের আয় আগের মতন হচ্ছে না। বেতসী তার মাকে আশ্বাস দিল — কোনও ভয় নেই, দু দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

জয়হরি হাজরার নামটি সেকেলে, কিন্তু সেজন্যে তার বাপ মাকে দায়ী করা যায় না, তার হরিভক্ত ঠাকুরদাদাই ওই নাম রেখেছিলেন। জয়হরি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, লেখাপড়ায় খুব ভাল, একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে বিলাত গিয়েছিল, সুতো আর কাপড় রঙানো শিখে তিন বছর পরে ফিরে এল। এসেই আমেদাবাদের একটি বড় মিলে তার চাকরি জুটে গেল। দু বছর পরে তা ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটি ব্লীচিং অ্যাণ্ড ডাইং ফ্যাক্টরি খুলল। সে কারখানা খুব ভালই চলছিল, লাভও বেশ হচ্ছিল, তার পর এক দুর্ঘটনা হল। জয়হরির শিকারের
স্টেটের জঙ্গলে একটা বুনো শুয়োরের আক্রম

হল। ঘা সারল, কিন্তু জয়হরি একটু খোঁড়া হয়ে গেল, হাঁটবার সময় তাকে লাঠিতে ভর দিতে হয়। এর কিছু আগে তার বাপ মা মারা গিয়েছিলেন। সে তার কারখানা ভাল দামে বেচে দিয়ে পৈতৃক পুরনো বাস্তুভিটা খাগড়াডাঙায় চলে এল। এই গ্রামটি হোগলবেড়ের লাগাও।

জয়হরির অর্থলোভ নেই, বিবাহেরও ইচ্ছা নেই। সে হিসাব করে দেখেছে তার যা পুঁজি আছে তাতে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যে বিদ্যা সে শিখেছে তার চর্চা একবারে ছাড়তে পারল না। খাগড়াডাঙার পুরনো ছোট বাড়িটা মেরামত করে বাসের উপযুক্ত করে নিল, এবং সেখানেই নানা রকম পরীক্ষা করে শখ মেটাতে লাগল। কিন্তু সুতো আর কাপড় ছোবানো নয়, জীবন্ত জন্তুর গায়ে রং ধরানো।

জয়হরির জমির একদিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, আর তিন দিকে ধান খেত। রাস্তার দিকে সে কাঁটা তারের বেড়া লাগিয়েছে, আর সব দিকে ফণিমনসা বাগভেরেণ্ডা ইত্যাদির পুরনো বেড়াই আছে। তার বাড়ির সামনে এখন আর জঙ্গল নেই, সুন্দর একটি মাঠ হয়েছে, তার মাঝে মাঝে কয়েকটি গাছ আছে। বাড়ির পিছন দিকে গোটাকতক চালা ঘর উঠেছে, তাতে তার পোষা জন্তু আর কয়েকজন চাকর থাকে। জয়হরি এখানে আসার কয়েক মাস পরেই দেখা গেল তার বাড়ির সামনের মাঠে হরেক রকম অদ্ভুত জানোয়ার [illegible] আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু লোক এসে দেখে

বেতসীর কাছে খবর পেঁছল, খাগড়াডাঙায় একজন খোঁড়া বাবু আজব চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, পয়সা লাগে না, কলকাতা থেকেও লোকে দেখতে আসছে। বেতসীর একটু রাগ হল। চাকলাদার বংশ এই অঞ্চলের সব চেয়ে মান্য গণ্য জমিদার। একজন বাইরের লোক এসে চিড়িয়াখানা বানিয়েছে অথচ সেখানে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্যে বেতসী আর তার মাকে অনুরোধ করা হয় নি কেন? বেতসী শুনেছে, লোকটার নাম জয়হরি হলেও সে নাকি বিলাত ফেরত, সুতরাং তাকে অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দিতে পারল না। কৌতূহল দমন করতে না পেরে একদিন সকাল বেলা সে তার প্রকাণ্ড কুকুর প্রিন্সকে সঙ্গে নিয়ে জয়হরির জন্তুর বাগান দেখতে গেল।

তারের বেড়ার ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বেতসী অবাক হয়ে দেখতে লাগল। তিনটে নীল রঙের ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। একটা সবুজ মেনী বেরালের কাছে চারটে বেগনী বাচ্চা লাফালাফি করছে। একটা অদ্ভুত জানোয়ার ঘাস খাচ্ছে, গায়ের রং হলদে, তার উপর ঘোর ব্রাউন রঙের ফোঁটা। বেতসী প্রথমে ভেবেছিল চিতা বাঘ, কিন্তু দাড়ি আর শিং দেখে বুঝল জন্তুটা আসলে ছাগল। একটু দূরে একটা ডোবার কাছে গোটা কতক ময়ূর-কণ্ঠী রঙের রাজহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করছে। বাড়ির ছাত থেকে হঠাৎ এক ঝাঁক লাল নারঙ্গী হলদে

পায়রা উড়ে চক্কর দিতে লাগল

আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে।

শরীরে রোগ নেই। কুকুররা এমন কামড়াকামড়ি করে থাকে, তাতে ক্ষতি হয় না। আপনি অনুমতি দেন তো আপনার কুকুরের পায়ে একটু টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিতে পারি।

— আপনার হাতুড়ে চিকিৎসা আমি চাই না। কেন আপনার কুকুরকে রুখলেন না? কত বড় বংশে আমার এই আলসেশ্যানের জন্ম তা জানেন? প্রিন্সের বাপ ফ্রেডারিক দি গ্রেট, মা মারাইয়া তেরেজা। আপনার নেড়ী কুত্তী একে কামড়াবে আর আপনি হাঁ করে দেখবেন!

— ঘটনাটা হঠাৎ হয়ে গেল, আগে টের পেলে আমি বাধা দিতাম। কিন্তু আসল দোষী আপনার কুকুর, ও কেন নেড়ী কুত্তীর কাছে গেল? উচ্চকুলোদ্ভব হলেও আপনার প্রিন্সের নজর ছোট। অনেক বোকা লোক পেণ্ট করা মেয়ে দেখলে ভুলে যায়। প্রিন্সও সেই রকম নেড়ী কুত্তীর গোলাপী রং দেখে ভুলেছে, জানে না যে ওটা কংগো রেডের রং।

— কাছে গেছে বলেই প্রিন্সকে কামড়াবে?

— আপনি একটু স্থির হয়ে ব্যাপারটি বোঝবার চেষ্টা করুন। আমি যদি হঠাৎ আপনাকে অপমান করতাম — খবরের কাগজে যাকে বলে শ্লীলতা হানি, তা হলে আপনি কি করতেন? চুপ করে সইতেন কি?

— আপনাকে লাথি মারতাম, হাতে চাবুক থাকলে আচ্ছা করে কষিয়ে দিতাম।

— ঠিক কথা, সে রকম করাই আপনার উচিত হত। নারী

মাত্রেরই আত্মসম্মান রক্ষার অধিকার আছে। আমাদের এই ভারতবর্ষ হচ্ছে বীরাঙ্গনা সতী নারীর দেশ। সেই ট্র্যাডিশন এ দেশের কুত্তীদের মধ্যেও একটু থাকবে তা আর বিচিত্র কি।

—ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না। আপনি ওই নেড়ী-টাকে গুলি করে মারবেন কিনা বলুন। আর আমার প্রিন্সের যে ইনফেকশন হল তার ড্যামেজ কি দেবেন বলুন।

—মাপ করবেন মিস চাকলাদার, কুত্তীটার বা আমার কিছু-মাত্র অপরাধ হয় নি। শুধু শুধু দণ্ড দেব কেন?

—বেশ। আমার উকিল আপনাকে চিঠি পাঠাবেন। আদালত আপনাকে রেহাই দেয় কিনা দেখব।

বাড়ি ফিরে এসে বেতসী স্থির হয়ে থাকতে পারল না, তখনই মোটরে চড়ে উলুবেড়ে গেল। সেখানকার উকিল বিষ্ণু বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তার বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাঁকে সব কথা উত্তেজিত ভাষায় তড়বড় করে জানিয়ে বেতসী বলল, ওই জয়হরি হাজরাকে সাজা দিতেই হবে জেঠামশাই, যত টাকা লাগে খরচ করব।

বিষ্ণুবাবু বললেন, আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর। যদি মনে কর যে তোমার কুকুরের রোগ হবার ভয় আছে তবে আজই ওকে কলকাতায় পাঠাও, বেলগাছিয়া হাসপাতালে অ্যান্টিরাবিজ ইনজেকশন দিয়ে দেবে। কিন্তু

মকদ্দমার খেয়াল ছাড়। জয়হরির কুকুরটা যদি খেপা হত আর তোমার কুকুরকে রাস্তায় কামড়ে দিত তা হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু তোমার কুকুর জয়হরির কম্পাউন্ডে ঢুকে কামড় খেয়েছে, এতে কোনও ক্লেম আনা যায় না, মকদ্দমা করলে লোক হাসবে।

বিষ্ণুবাবু কিছুই করতে রাজী হলেন না। বেতসী তাঁর কাছ থেকে সোজা মহকুমা হাকিম অরুণ ঘোষের বাড়ি গেল। তাঁকে নিজের পরিচয় আর ব্যাপারটা জানিয়ে বলল, সার, আপনাকে এর প্রতিকার করতেই হবে, আপনি পুলিসকে অর্ডার দিন। জয়হরির খেঁকী কুকুরটা ডেঞ্জারস, তাকে এখনই মারা দরকার। আর জয়হরি একটা বুজরুক শারলাটান, নকল জানোয়ার বানিয়ে লোক ঠকাচ্ছে। জন্তুর গায়ে রং ধরানো তো একরকম ক্রুয়েলটিও বটে। তাকে অর্ডার করুন যেন তিন দিনের মধ্যে তার চিড়িয়াখানা ভেঙে দেয়।

অরুণ ঘোষ একটু হেসে বললেন, আচ্ছা, আমি পুলিসকে বলে দিচ্ছি যেন জয়হরিবাবুর কুকুরটার খবর রোজ নেওয়া হয়। হাইড্রোফোবিয়ার লক্ষণ দেখলে অবশ্যই তাকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু জয়হরিবাবু যা করছেন তা তো বেআইনী নয়, সাধারণের অনিষ্টকরও নয়। তাঁকে তো আমি জব্দ করতে পারি না মিস চাকলাদার।

বেতসী অত্যন্ত রেগে গিয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এল। অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করল, সে নিজেই জয়হরিকে সাজা দেবে। আগে একটা আল্টিমেটম দেবে, তা যদি না শোনে তবে মার

লাগাবে। লোকটা খোঁড়া, বেশী মারা ঠিক হবে না, এক ঘা চাবুক লাগালেই যথেষ্ট। জনকতক লোক যাতে জয়হরির নিগ্রহ দেখে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। লোকে জানুক যে বেতসী চাকলাদার নিজেই বজ্জাতকে শাসন করতে পারে।

বেতসী তার ধোবা নিমাই দাস আর সর্দার-মালী গগন মণ্ডলকে ডেকে আনিয়ে বলল, ওহে, কাল সকালে আটটার সময় তোমরা জয়হরি হাজরার চিড়িয়াখানার সামনে হাজির থেকো।

নিমাই বলল, সেখানে গিয়ে কি করতে হবে দিদিসায়েব ?

—কিছু করতে হবে না, শুধু একটা তামাশা দেখবে।

—যে আজ্ঞে, আমার ভাগনে নুটুকেও নিয়ে যাব।

গগন মণ্ডল বলল, আমার ছেলে দুটোকেও নিয়ে যাব দিদিসায়েব।

পরদিন সকাল বেলা বেতসী তার আরবী ঘোড়ায় চড়ে একটা চাবুক হাতে নিয়ে জয়হরির মাঠের সামনে উপস্থিত হল। নিমাই ধোবা আর গগন মালী তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আগেই সেখানে হাজির ছিল।

জয়হরি বেড়ার ধারে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে তার ভেড়া আর ছাগলের পরস্পর ঢু মারা দেখছিল। বেতসীকে দেখে স্মিত-মুখে বলল, গুড মর্নিং মিস চাকলাদার, আপনার প্রিন্স ভাল আছে তো ?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেতসী বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একবার বাইরে আসুন।

ফটকের বাইরে এসে জয়হরি বলল, হুকুম করুন।

ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসে বেতসী বলল, দেখুন জয়হরিবাবু, আপনাকে একটা আলটিমেটম দিচ্ছি। কাল আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চাইবেন কি না? আর সেই নেড়ী কুত্তীটাকে গুলি করবেন কি না? নিতান্ত যদি মায়া হয় তবে গঙ্গার ওপারে বিদায় করবেন কি না?

জয়হরি বলল, দুঃখপ্রকাশে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, আপনি অকারণে আমার উপর চটেছেন তাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু ক্ষমা চাইতে বা নেড়ী কুত্তীকে মারতে বা তাড়াতে পারব না।

চাবুক তুলে বেতসী বলল, তবে এই নিন।

বেতসীর চাবুক জয়হরির পিঠে পড়বার আগে একটু পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর বিবরণ আবশ্যক। মাঠের একটা কদম গাছের আড়াল থেকে একটি জেব্রা বেরিয়ে এল, কিন্তু বেতসীর নজর সেদিকে ছিল না। এই ভারতীয় জন্তুটি আফ্রিকার জেব্রার চাইতে কিছু ছোট, পেট একটু বেশী মোটা, কিন্তু গায়ের রং আর ডোরা দাগে কোনও তফাত নেই। অচেনা জানোয়ার দেখে নিমাই ধোবার ভাগনে নুটু বলল, মামা, ওটা কি গো?

নিমাই বলল, চিনতে লারছিস? ও তো আমাদের সৈরভী রে, সেই যে গাধীটার মাজায় বাত ধরেছিল, বোঁচকা বইতে লারত,

তাই তো জয়হরিবাবুকে দশ টাকায় বেচে দিনু। আহা, এখন ভাল খেয়ে আর জিরেন পেয়ে সৈরভীর কিবে রূপ হয়েছে দেখ! বাবু আবার চিত্তির বিচিত্তির করে বাহার বাড়িয়ে দিয়েছে।

সৈরভী তার পুরনো মনিবকে চিনতে পেরে খুশী হয়ে এগিয়ে আসছিল। বেতসীর চাবুক যখন জয়হরির পিঠে পড়বার উপক্রম করছে ঠিক সেই মুহূর্তে সৈরভীর কণ্ঠ থেকে আনন্দ-ধ্বনি নির্গত হল—ভূঁ-চী ভূঁ-চী। তার অদ্ভুত রূপ দেখে আর ডাক শুনে বেতসীর ঘোড়া সামনের দু পা তুলে চিঁ-হি-হি করে উঠল। বেতসী সামলাতে পারল না, ধুপ করে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান।

জ্ঞান ফিরে এলে বেতসী দেখল, একটা ছোট গেলাস তার মুখের কাছে ধরে জয়হরি বলছে, এটুকু খেয়ে ফেলুন, ভাল বোধ করবেন।

ক্ষীণ স্বরে বেতসী প্রশ্ন করল, কি ওটা?

—বিষ নয়, ব্রান্ডি। খেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

—আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

—এখন দেখছেন না, একটু আগে দেখছিলেন বটে। আপনি যেন মহিষাসুর বধের জন্যে খাঁড়া উঁচিয়েছেন, কিন্তু আপনার বাহনটি হঠাৎ ভড়কে গিয়ে আপনাকে ফেলে দিল। তাতেই আপনার একটু চোট লেগেছে। নিমাই আর গগনের বউ ধরাধরি

করে আপনাকে আমার বাড়িতে এনে শ্বইয়েছে। ওকি করছেন? খবরদার ওঠবার চেষ্টা করবেন না, চুপ করে শ্বয়ে থাকুন। আপনার মায়ের কাছে লোক গেছে, ডাক্তার নাগকে আনবার জন্যে উলব্বেড়েতে মোটর পাঠানো হয়েছে। তাঁরা এখনই এসে পড়বেন।

একটব্ব পরে বেতসীর মা এসে পড়লেন। আরও কিছব্ব পরে ডাক্তার নাগ তাঁর ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢব্বকলেন। বেতসীকে পরীক্ষা করে বললেন, হাতে আর কোমরে চোট লেগেছে, ও কিছব্ব নয়, চার-পাঁচ দিনে সেরে যাবে। ডান পায়ের ফিবিউলা ভেঙেছে — সামনের সরব্ব হাড়টা।...হাঁ হাঁ জোড়া লাগবে বইকি। ভয় নেই, খোঁড়া হয়ে যাবেন না, কিছব্বদিন পরেই আগের মতন হাঁটতে পারবেন। ... আরে না না, জয়হরিবাবব্বর মতন লাঠি নেবার দরকার হবে না। আজ কাঠ দিয়ে বেঁধে দেব, তিন-চার দিন পরে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করাব, তার পর প্লাস্টার ব্যান্ডেজ লাগাব। দরকার হয় তো একজন নার্স পাঠাতে পারি।

বেতসী নিজের বাড়িতে এলে ডাক্তার তার চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। বিছানায় শ্বয়ে সে বিগত ঘটনাবলী ভাবতে লাগল।

নায়েব হরকালী মাইতি বহব্বদিনের পব্বরনো লোক। তাঁর স্ত্রী মাইতি-গিন্নী শয্যাগত বেতসীকে রোজ সন্ধ্যাবেলা দেখতে আসেন। বব্বড়ীর মব্বখের বাঁধন নেই, কিন্তু তাঁর এলোমেলো কথায় বেতসী চটে না, বরং মজা পায়। পড়ে যাবার দব্ব সপ্তাহ

পরে বেতসী অনেকটা ভাল বোধ করছে, বিছানা ছেড়ে ইজি-চেয়ারে বসেছে।

মাইতি-গিন্নী তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন—সবই গেরোর ফের দিদিমণি, কপালের লিখন। ভদ্দর লোকের ছেলের ওপর কেনই বা তোমার রাগ হল, কেনই বা মেমসায়েবের মতন ঘোড়সওয়ার হয়ে তাকে মারতে গেলে! তার তো কিছুই হল না, লাভের মধ্যে তুমি ঠ্যাং ভাঙলে।

বেতসী বলল, তুমি দেখো মাইতি-দিদি, আমি সেরে উঠে তাকে চাবুক মেরে জব্দ করি কি না।

—হা রে দিদিমণি, চাবুক মেরে কি বেটাছেলেকে জব্দ করা যায়! ওদের একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে হয়, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটতে হয়। বেটাছেলে টিট করবার দাবাই হল আলাদা।

—দাবাইটা তুমি জান নাকি?

—ওমা তা আর জানি না! সাড়ে তিন কুড়ি বয়েস হল, তিন কুড়ি বছর ধরে বুড়ো মাইতির কাঁধে চেপে রইছি। দাবাইটা বলছি শোন। আগে ভুলিয়ে ভালিয়ে বশ করতে হয়, আশকারা দিয়ে যত্ন আত্তি করে মাথাটি খেতে হয়। তার পর যখন খুব পোষ মানবে, তুমি না হলে তার চলবেই না, তখন নাকে দড়ি দিয়ে চরকি ঘোরাবে, নাজেহাল করবে, কড়া কড়া চোপা ছাড়বে, নাকানি চোবানি খাওয়াবে। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই দিদিমণি, আগেই চাবুক মারতে গিয়েছিলে। তাই তো গাধা ডেকে উঠল,

ঘোড়া ভড়কাল, তুমি পড়ে গিয়ে পা ভাঙলে। জয়হরিবাবু মানুষটা তো মন্দ নয়, এখানে এসে তোমার খবর নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে শুনতে কথাবার্তায় ভালই, তোমারই মতন বিলেত দেখা আছে, সেও খোঁড়া তুমিও খোঁড়া। বাধা তো কিছুই দেখছি না, কিন্তু তোমার মা যে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, অমন মার-মুখো খাণ্ডার মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না, কিন্তু তাই বলে জয়হরির মতন পাত্র তো হাতছাড়া করতে পারি না, আমার ভাইঝি বেবির সঙ্গে তার সম্বন্ধের চেষ্টা করব, দাদাকে লিখব বেবিকে যেন এখানে পাঠিয়ে দেন।

মাইতি-গিন্নী চলে যাবার পর বেতসীর মনে নানা রকম ভাবনা ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সম্মুখ সমরে তার পরাজয় হয়েছে, সে জখম হয়ে বাড়িতে আটকে আছে। ডাক্তারের মতন মিথ্যাবাদী দুটি নেই, এই সেদিন বলল এক মাস, আবার এখন বলছে তিন মাস। ওদিকে শত্রু হাসছে, তার নেড়ী কুত্তী আর গাধাটাও বোধ হয় হাসছে। জয়হরির আস্পর্ধা কম নয়, এখানে এসে খোঁজ নিয়ে মহত্ত্ব দেখাচ্ছে। বেবিকে বিয়ে করবেন? ইস, করলেই হল! বেতসী শত্রুকে কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবে না, মাইতি-বুড়ীর দাবাই প্রয়োগ করবে। কূট যুদ্ধে শত্রুকে কাবু করে বশে আনাতেও তো বাহাদুরি আছে। জয়হরি গাধাকে জেব্রা বানিয়েছে, বেতসী কি জয়হরিকে ভেড়া বানাতে পারবে না? সারা রাত তার ঘুম হল না, মনের মধ্যে যেন ঝড় বইতে লাগল।

সকালে উঠেই বেতসী আরশিতে নিজের মুখখানা একবার

দেখে নিল, তার পর মতি স্থির করে শত্রুর প্রতি তার প্রথম বোমা ছাড়ল, জয়হরিকে দু লাইন চিঠি লিখে পাঠাল — আপনার কুত্তী আর গাধাটাকে ক্ষমা করলুম, আপনাকেও করলুম। আপনিও আমাকে ক্ষমা করতে পারেন।

১৩৬২

শিবামুখী চিমটে

ঝিণ্টুর মুখ থেকে থার্মমিটার টেনে নিয়ে তার মা বললেন, নিরেনব্বুই পয়েন্ট চার। আজ রাত্তিরে শুধু দুধবার্লি খাবি। ঘুরে বেড়াবি না, এই ঘরে থাকবি। আমাদের ফিরতে কতই আর দেরি হবে, এই ধর রাত বারোটা।

ঠোঁট ফুলিয়ে ঝিণ্টু বলল, বা রে, তোমরা সক্কলে মজা করে মাদ্রাজী ভোজ খাবে আর আমি একলাটি বাড়িতে পড়ে থাকব, হুঁ—

—আরে রাম বল, ওকে কি ভোজ বলে! মাছ নেই, মাংস নেই, শুধু তেঁতুলের পোলাও, লংকার ঝোল, আর টক দই। যজ্ঞস্বামী আয়ার ওঁর অফিসের বড় সায়েব, তাঁর মেয়ের বিয়ে, আর আয়ার-গিন্নীও অনেক করে বলেছে, তাই যাচ্ছি। তোর জন্যে এই মেকানো রইল, হাওড়া ব্রিজ তৈরি করিস। সুকুমার রায়ের তিনখানা বই রইল ছবি দেখিস। কিন্তু বেশী পড়িস নি, মাথা ধরবে। তোর পিসীকে বলে যাচ্ছি রাত সাড়ে আটটায় দুধ-বার্লি দেবে। খেয়েই শুয়ে পড়বি। পিসী তোর কাছে শোবে।

—না, পিসীমাকে শুতে হবে না। তার ভীষণ নাক ডাকে, আমার ঘুম হবে না। আমি একলাই শোব।

—বেশ, তাই হবে।

ঝিন্টুর বয়স দশ, লেখাপড়ায় মন্দ নয়, কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল

আর দুরন্ত। তার মা বাবা আর ছোট বোন নিমন্ত্রণ খেতে গেল আর সে একলা বাড়িতে পড়ে রইল এ অসহ্য। একটু জ্বর হয়েছে তো কি হয়েছে? সে এখনই দু মাইল দৌড়ুতে পারে, ব্যাডমিন্টন খেলতে পারে, সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তেতলার ছাতে উঠতে পারে। বাড়িতে গল্প করারও লোক নেই। পিসীমাটা যেন কি, দুপুর বেলা আপিসে যায় আর সকালে বিকেলে রাত্তিরে শুধু নভেল পড়ে। ঝিণ্টুর ক্লাসফ্রেন্ড জিতুর পিসীমা কেমন চমৎকার বুড়ো মানুষ, কত রকম গল্প বলতে পারে। জিতু বলে, হ্যাঁরে ঝিণ্টু, তোর সরসী পিসী সেজেগুজে আপিস যায় কেন? মালা জপবে, বড়ি দেবে, নারকেলনাড়ু আমসত্ত্ব কুলের আচার বানাবে, তবে না পিসীমা!

মেকানো জোড়া দিয়ে ঝিণ্টু অনেক রকম ব্রিজ করল, আবার খুলে ফেলল। সাড়ে আটটার সময় সরসী পিসী তাকে দুধ-বার্লি খাইয়ে বলল, এইবার ঘুমিয়ে পড় ঝিণ্টু।

ঝিণ্টু বলল, সাড়ে আটটায় বুঝি লোকে ঘুমোয়? তুমি তো অনেক বই পড়, তা থেকে একটা গল্প বল না।

সরসী উত্তর দিল, ও সব গল্প তোর ভাল লাগবে না।

—খালি প্রেমের গল্প বুঝি?

—অতি জেঠা ছেলে তুই। বড়দের জন্যে লেখা গল্প ছোটদের ভাল লাগে নাকি? এই তো সেদিন তোর মা শেষের কবিতা পড়েছিল, তুই শুনে বললি, বিচ্ছিরি। আলো নিবিয়ে দিই, ঘুমিয়ে পড়।

সরসী পিসী চলে গেলে ঝিণ্টু শুয়ে পড়ল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। এক ঘণ্টা এপাশ ওপাশ করে সে বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে পড়ল। তার মাথায় খেয়াল এসেছে, একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে হবে। ডিটেকটিভ, ডাকাত, বোম্বেটে, গুপ্ত ধন, এই সবের গল্প সে অনেক পড়েছে। আজ রাত্রে যদি সে গুপ্ত ধন আবিষ্কার করতে পারে তো কেমন মজা হয়! সে তার মায়ের কাছে শুনেছিল, তার এক বৃদ্ধপ্রজেঠামহ অর্থাৎ প্রপিতা-মহের জেঠা পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। অনেককাল হল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর তোরঙ্গটি তেতলার ঘরে এখনও আছে। সেই তোরঙ্গ খুলে দেখলে কেমন হয়?

ঝিন্টুর একটা টর্চ আছে, দেড় টাকা দামের একটা পিস্তলও আছে। পিস্তলটা কোমরে ঝুলিয়ে টর্চ নিয়ে সে তেতলায় উঠল। সেখানে সিঁড়ির পাশে একটি মাত্র ঘর, তাতে শুধু অদরকারী বাজে জিনিস থাকে। সেই ঘরে ঢুকে ঝিণ্টু সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তার বৃদ্ধপ্রজেঠামহ করালীচরণ মুখুজ্যের তোরঙ্গটা এক কোণে রয়েছে। বেতের তৈরি, তার উপর মোষের চামড়া দিয়ে মোড়া, অদ্ভুত গড়ন, যেন একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ। যে তালা লাগানো আছে তাও অদ্ভুত। দেয়ালে এক গোছা পুরনো চাবি ঝুলছে। ঝিন্টু একে একে সব চাবি দিয়ে তালা খোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে হতাশ হয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, হঠাৎ নজরে পড়ল, তোরঙ্গের পিছনের কবজা দুটো মরচে পড়ে খয়ে গেছে। একটু টানাটানি করতেই খসে গেল। ঝিন্টু

তখন তোরঙ্গের ডালা পিছন থেকে উলটে খুলে ফেলল।

বিশ্রী ছাতা ধরা গন্ধ। উপরে কতকগুলো ময়লা গেরুয়া রঙের কাপড় রয়েছে, তার নীচে এক গোছা তালপাতায় লেখা পুঁথি আর তিনটে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। তার নীচে আবার কাপড়, তামার কোষা কুষি, সাদা রঙের সরার মতন একটা পাত্র, একটা মরচে ধরা ছোট ছুরি, একটা সরু কলকে, অত্যন্ত ময়লা এক টুকরো নেকড়া, আর একটা চিমটে। ঝিণ্টু যদি চৌকস লোক হত তা হলে বুঝত—সাদা সরাটা হচ্ছে খর্পর অর্থাৎ মড়ার মাথার খুলি, আর ছুরি কলকে নেকড়া চিমটে হচ্ছে গাঁজা খাওয়ার সরঞ্জাম।

বিরক্ত হয়ে ঝিণ্টু বলল, দুত্তোর, টাকা কড়ি হীরে মানিক কিচ্ছু নেই। তবে চিমটেটি মন্দ নয়, আন্দাজ এক ফুট লম্বা, মাথায় একটা আংটা, তাতে আবার আরও তিনটে আংটা গোছা করে লাগানো আছে। চিমটের গড়ন বেশ মজার, টিপলে মুখটা শেয়ালের মতন দেখায়, দু পাশে দুটো চোখ আর কানও আছে। বহুকালের জিনিস হলেও মরচে ধরে নি, বেশ চকচকে। তোরঙ্গ বন্ধ করে চিমটে নিয়ে ঝিণ্টু তার ঘরে ফিরে এল।

আলো জেবলে বিছানায় বসে ঝিণ্টু সুকুমার রায়ের বইগুলো কিছুক্ষণ উলটে পালটে দেখল। পাশের ঘরের ঘাড়তে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। এইবারে ঘুম পাচ্ছে, শোবার আগে সে আর একবার চিমটেটা ভাল করে দেখল। নাড়া পেয়ে মাথার আংটা-

গুলো ঝমঝম করে বেজে উঠল। তার পরেই এক আশ্চর্য কাণ্ড।

দরজা ঠেলে এক অদ্ভুত মূর্তি ঘরে ঢুকল। বেঁটে গড়ন, ফিকে ব্লুব্ল্যাক কালির মতন গায়ের রং, মাথার চুলে ঝুঁটি বাঁধা, মুখখানা বাঁদরের মতন, নন্দলালের আঁকা নন্দীর ছবির সঙ্গে কতকটা মিল আছে। পরনে গেরুয়া রঙের নেংটি, পায়ে খড়ম। মূর্তি বলল, কি চাও হে খোকা?

ঝিণ্টু প্রথমটা ভয়ে আঁতকে উঠল। কিন্তু সে সাহসী ছেলে, মূর্তিমান অ্যাডভেঞ্চার তার সামনে উপস্থিত হয়েছে, এখন ভয় পেলে চলবে কেন। ঝিণ্টু প্রশ্ন করল, তুমি কে?

—চন্দ্রদাস চণ্ড। তোমার এক পূর্বপুরুষ পিশাচসিদ্ধ হয়েছিলেন তা শুনেছ? আমি সেই পিশাচ।

—তোমাকেই সিদ্ধ করেছিলেন বুঝি?

—দূর বোকা, আমাকে সিদ্ধ করে কার সাধ্য! তিনি সাধনা করে নিজেই সিদ্ধ হয়েছিলেন, আমাকে বশ করেছিলেন। ওই শিবামুখী চিমটেটি আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হয়েছিল যে চিমটে বাজালেই আমি হাজির হব, আমাকে যা করতে বলা হবে তাই করব। কিন্তু করালী মুখুজ্যে ছিলেন নির্লোভ সাধু পুরুষ, কখনও ধন দৌলতের জন্যে আমাকে ফরমাশ করেন নি। শুধু হুকুম করতেন—লে আও তম্বাকু, লে আও গঞ্জা, লে আও ওমদা কারণবারি বিলায়তী শরাব, লে আও অচ্ছী অচ্ছী ভৈরবী। তিনি মারা যাবার পর থেকে আমি নিষ্কর্মা হয়ে আছি। শোন খোকা—আজ হল বৈশাখী অমাবস্যা। এক

শ বছর আগে এই অমাবস্যার রাত দুপুরে তোমার প্রপিতামহের জেঠা করালীচরণ মুখুজ্যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শর্ত অনুসারে আজ ঠিক সেই লগ্নে আমি কিংকরত্ব থেকে মুক্তি পাব, তার পর যতই চিমটে বাজাও আমি সাড়া দেব না। এখনও ঘণ্টা দুই সময় আছে। তোমার ডাক শুনে আমি এসেছি, কি চাই বল।

একটু ভেবে ঝিণ্টু বলল, একটা হাঁসজারু দিতে পার?

—সে আবার কি?

ঝিন্টু বই খুলে ছবি দেখিয়ে বলল, এই রকম, জন্তু, হাঁস আর শজারুর মাঝামাঝি।

—ও, বুঝেছি। কিন্তু এ রকম জানোয়ার তো রেডিমেড পাওয়া যাবে না, সৃষ্টি করতে সময় লাগবে। ঘণ্টাখানিক পরে আমি একটা হাঁসজারু পাঠিয়ে দেব।

ঝিণ্টু বলল, তা না হয় এক ঘণ্টা দেরিই হল, ততক্ষণ আমি ঘুমুব। কিন্তু তুমি বেশী দেরি ক'রো না, মা বাবা সবাই এসে পড়বে।

পিশাচ অন্তর্হিত হল।

ঝিন্টু ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ খুটখুট শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। আলো জ্বালাই ছিল, ঝিন্টু দেখল, একটা কিম্ভুত কিমাকার জানোয়ার ঘরে ছুটোছুটি করছে। তার মাথা আর গলা হাঁসের মতন, ধড় শজারুর মতন, সমস্ত গায়ে কাঁটা খাড়া

হয়ে আছে, চার পায়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকছে। ঝিণ্টু উঠে বসল, আদর করে ডাকল — আ আ চু চ্চু চু। হাঁস-জারু পোষা কুকুরের মতন লাফিয়ে দুই থাবা তুলে কোলে উঠতে গেল। ঝিন্টুর হাঁটুতে কাঁটার খোঁচা লাগল, সে বিরক্ত হয়ে বলল, যাঃ, সরে যা, গায়ে যে একটু হাত বুলিয়ে দেব তারও জো নেই!

এই ঘরের ঠিক নীচের ঘরটি সরসী পিসীর। খাওয়ার পর সরসী একটা গোটা উপন্যাস সাবাড় করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাথার উপর দুপদাপ শব্দ হওয়ায় তার ঘুম ভেঙে গেল, বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ, পাজী ছেলেটা এখনও ঘুময় নি, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সরসী উপরে উঠে ঝিণ্টুর ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে বলল, ও মা গো, এটা আবার কোত্থেকে এল!

ঝিণ্টু বলল, ও আমি পুষেছি, কোনও ভয় নেই, কিচ্ছু বলবে না। কাল নাপিত ডেকে গায়ের কাঁটা ছাঁটিয়ে দেব, তা হলে আর হাতে ফুটবে না। একটু দুধ আর বিস্কুট এনে দাও না পিসীমা, বেচারার খিদে পেয়েছে।

আত্মরক্ষার জন্য সরসী ঝিণ্টুর খাটের উপর উঠে বলল, এটাকে কোত্থেকে পেয়েছিস শিগ্গির বল ঝিণ্টে।

হাত নেড়ে মুখভঙ্গী করে ঝিণ্টু বলল, ইঃ বলব কেন!

— লক্ষ্মীটি বল কোথা থেকে এটা এল।

— আগে দিব্বি গাল যে কারুকে বলবে না।

— কালীঘাটের মা কালীর দিব্বি, কাকেও বলব না।

ঝিণ্টু তখন সমস্ত ব্যাপারটি খুলে বলল। সরসীর বিশ্বাস হল না, বলল, তুই বানিয়ে বলছিস ঝিণ্টে। করালী জেঠা পিশাচসিদ্ধ ছিলেন এই রকম শুনেছি বটে, কিন্তু ও একটা বাজে গল্প।

— বাজে গল্প! তবে এই দেখ —

ঝিণ্টু চিমটে নেড়ে ঝন ঝন শব্দ করতেই ঢুণ্ঢুদাস চণ্ডের আবির্ভাব হল। সরসী ভয়ে কাঠ হয়ে চোখ কপালে তুলে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। পিশাচ বলল, কি চাই খোকা?

ঝিণ্টু হুকুম করল, গরম মটর ভাজা, বেশ বড় বড়। বেশী করে দিও, পিসীমাও খাবে।

পিশাচ অন্তর্হিত হল। একটু পরেই একটা কাগজের ঠোঙা শূন্য থেকে ধপ করে ঘরের মেঝেতে পড়ল। সদ্য ভাজা বড় বড় মটরে ভরতি, এখনও গরম রয়েছে। এক মুঠো নিয়ে ঝিন্টু বলল, পিসীমা, একটু খেয়ে দেখ না।

সরসী গালে হাত দিয়ে বলল, অবাক কাণ্ড! বাপের জন্মে এমন দেখি নি, শুনিও নি। কিন্তু তুই কি বোকা রে খোকা! কোথায় দু-চার লাখ টাকা, মস্ত বাড়ি, দামী মোটর গাড়ি, এই সব চাইবি, তা নয়, চাইলি কিনা হাঁসজারু আর মটর ভাজা! ছি ছি ছি। আচ্ছা, তোর ওই চিমটেটা একবারটি আমাকে দে তো।

পিসীর উপর ঝিণ্টুর কোনও দিনই বিশেষ টান নেই। ভেংচি কেটে বলল, ইস দিলুম আর কি! এই শেয়ালমুখো চিমটে আমি কারুক্কে দিচ্ছি না। তোমার কোন্ জিনিস দরকার বল না, আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

— তুই ছেলে মানুষ, গুছিয়ে বলতে পারবি না।

— আচ্ছা, আমি চুণ্ডুদাসকে ডাকছি। তুমি যা চাও আমাকে বলবে, আর আমি ঠিক সেই কথা তাকে বলব।

অগত্যা সরসী রাজী হল। ঝিন্টু চিমটে নাড়তেই আবার পিশাচ এসে বলল, কি চাই?

ঝিন্টু বলল, চটপট বলে ফেল পিসীমা, এখুনি হয়তো বাবা মা এসে পড়বে।

ঝিণ্টুর জবানিতে সরসী যা চাইল তার তাৎপর্য এই। — আগে ওই জানোয়ারটাকে বিদেয় করতে হবে। অর পর দুর্লভ তালুক-দার নামক এক ভদ্রলোককে ধরে আনতে হবে। তিনি কানপুর উলেন মিলে চাকরি করেন। বাসার ঠিকানা জানা নেই।

হাঁসজারু আর পিশাচ অন্তর্হিত হল।

ঝিণ্টু বলল কানপুরের ভদ্রলোককে এনে কি হবে পিসীমা?

— তাকে আমি বিয়ে করব।

— বিয়ে করবে কি গো! তুমি তো বুড়ো ধাড়ী হয়েছ।

— কে বলল বুড়ো ধাড়ী! আমার বয়স তো সবে পঁচিশ।

— মা যে বলে তোমার বয়েস চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ?

— মিথ্যে কথা, তোর মা হিংসুটে তাই বলে। আর আমি তো আইবুড়ো মেয়ে, বয়েস যাই হক বিয়ে করব না কেন?

পিশাচ ফিরে আসবার আগে একটু পূর্বকথা বলা দরকার। বারো-তেরো বছর পূর্বে সরসী যখন কলেজে পড়ত তখন দুর্লভ তালুকদারের সঙ্গে তার ভাব হয়। দুর্লভ বলেছিল, আমার

একটি ভাল চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে, পেলেই তোমাকে বিয়ে করব। কিছুদিন পরে দুর্লভ চাকরি পেয়ে কানপুরে গেল। সেখান থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখত—বড় মাগ্‌গি জায়গা, তোমার উপযুক্ত বাসাও পাই নি, মাইনে মোটে দু শ টাকা, দুজনের চলবে কি করে? আশা আছে শীঘ্রই সাড়ে তিন শ টাকার গ্রেডে প্রমোশন পাব, ভাল কোয়ার্টার্সও পাব। লক্ষ্মীটি সরসী, তত দিন ধৈর্য ধরে থাক। তার পর ক্রমশ চিঠি আসা কমতে লাগল, অবশেষে একেবারে বন্ধ হল। সরসী বুঝল যে দুর্লভ মিথ্যাবাদী, কিন্তু তবু তাকে সে ভুলতে পারে নি।

পিশাচ একটি মোটা লোককে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে ধপ করে মেঝেতে ফেলে বলল, এই নাও খোকা, তোমার পিসীর বর। এখন বেহুঁশ হয়ে আছে, একটু পরেই চাঙ্গা হবে।

দুর্লভের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ঝিণ্টু বলল, উঃ, মামাবাবু ক্লাব থেকে ফিরে এলে যে রকম গন্ধ বেরয় সেই রকম লাগছে। ও ঢুণ্ঢু মশাই, একে জাগিয়ে দাও না।

পিশাচ বলল, নেশায় চুর হয়ে আছে। কানপুরের একটা বস্তিতে ওর ইয়ারদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল, সেখান থেকে তুলে এনেছি। এই, উঠে পড় শিগ্‌গির।

ঠেলা খেয়ে দুর্লভের চেতনা ফিরে এল। চোখ মেলে বলল, তোমরা আবার কে?

ঝিণ্টু বলল, পিসীমা, যা বলবার তুমি একে বল।

—আমি পারব না, তুই বল খোকা।

—ও মশাই, শুনছেন? এ হচ্ছে আমার সরসী পিসীমা, আইবুড়ো মেয়ে। একে আপনি বিয়ে করুন।

দুর্লভ বলল, আহা কি কথাই শোনালে! বিয়ে কর বললেই বিয়ে করব?

পিশাচ বলল, করবি না কি রকম? তোর বাবা করবে।

একটি পৈশাচিক চড় খেয়ে দুর্লভ বলল, মেরো না বাবা, ঘাট হয়েছে। বেশ, বিয়ে করছি, পুরুত ডাক। কিন্তু বলে রাখছি, অলরেডি আমার একটি বাঙালী স্ত্রী আর খোট্টা জরু আছে। সরসী যদি তিন নম্বর সহধর্মিণী হতে চায় আমার আর আপত্তি কি। সবাই মিলে এক বিছানায় শুতে হবে কিন্তু।

সরসী বলল, দূর করে দাও হতভাগা মাতালটাকে।

ঝিণ্টুর আদেশে পিশাচ দুর্লভকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ঝিণ্টু বলল, আচ্ছা পিসীমা, তোমার আপিসে তো অনেক ভাল ভাল বাবু আছে, তাদের একজনকে আনাও না।

একটু ভেবে সরসী বলল, আমাদের হেড অ্যাসিস্টাণ্ট যোগীন বাঁড়ুজ্যের স্ত্রী দু বছর হল মারা গেছে। যোগীনবাবু লোকটি ভাল, তবে কালচার্ড নয়, একটু বয়সও হয়েছে। বড্ড তামাক খায়, কথা বললে হুঁকো হুঁকো গন্ধ ছাড়ে। তা কি আর করা যাবে, অত খুঁত ধরলে চলে না, সব পুরুষই মোর অর লেস ডার্টি। কিন্তু যোগীনবাবু রাজী হবে কি? মোটা বরপণ পেলে হয়তো—

ঝিণ্টু বলল, বরপণ কি? গয়না আর টাকা? সে তুমি ভেবো না পিসীমা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চিমটে বাজিয়ে পিশাচকে ডেকে ঝিণ্টু বলল, পিসীমার আপিসে সেই যে যোগীন বাঁড়ুজ্যে কাজ করে—ঠিকানাটা কি পিসীমা? তিন নম্বর বেচু মিস্ত্রী লেন—সেইখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে এস। আর শোন, পিসীমাকে একগাদা গয়না আর অনেক টাকা দাও।

সরসীর সর্বাঙ্গ মোটা মোটা সোনার গহনায় ভরে গেল, পাঁচটা থলিও ঝনাত করে তার পায়ের কাছে পড়ল। পিশাচ চলে গেল।

একটা থলি তুলে সরসী বলল, সের পাঁচ-ছয় ওজন হবে।

ঝিণ্টু বলল, পাঁচ শ টাকায় সওয়া ছ সের, হাজার টাকায় সাড়ে বারো সের, লাখ টাকায় একত্রিশ মন দশ সের। 'জ্ঞানের সিন্দুক' বইএ আছে।

পিশাচ যোগীন বাঁড়ুজ্যেকে পাঁজাকোলা করে এনে মেঝেতে ফেলল।

ঝিণ্টু বলল, এও নেশা করেছে নাকি?

পিশাচ বলল, নেশা নয়, অজ্ঞান করে নিয়ে এসেছি, একটু ঠেলা দিলেই চাঙ্গা হবে। থাম, আগে আমি সরে পড়ি, নয়তো আমাকে দেখে আবার ভিরমি যাবে।

ঠেলা খেয়ে যোগীন বাঁড়ুজ্যে উঠে বসলেন। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললেন, দুর্গা দুর্গা, এ আমি কোথায়? একি, মিস সরসী মুখার্জি এখানে যে! উঃ, কত গহনা পরেছেন! আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণে এসেছি নাকি?

মুখ নীচু করে সরসী বলল, খোকা, তুই বল।

ঝিণ্টু বলল, সার, আপনি আমার এই সরসী পিসীমাকে বিয়ে করুন, ইনি আইবুড়ো মেয়ে, বয়েস সবে পঁচিশ। দেখছেন তো, কত গয়না, আবার পাঁচ থলি টাকাও আছে, এক-একটা পাঁচ-ছ সের।

যোগীনবাবু বললেন, বাঃ খোকা, তুমি নিজেই সালংকারা পিসীকে সম্প্রদান করছ নাকি? তা আমার অমত নেই, মিস মুখার্জির ওপর আমার একটু টাঁকও ছিল। তবে কিনা ইনি হলেন মডার্ন মহিলা, তাই এগুতে ভরসা পাই নি। গহনাগুলো বড্ড সেকেলে, কিন্তু বেশ ভারী মনে হচ্ছে, বেচে দিয়ে নতুন ডিজাইনের গড়ালেই চলবে। কিন্তু ব্যাপারটা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, এখানে আমি এলুম কি করে?

সরসী বলল, সে কথা পরে শুনবেন। এখন বাড়ি যান, কাল সকালে এসে আমার দাদাকে বিবাহের প্রস্তাব জানাবেন। এই আংটিটা পরুন, তা হলে ভুলে যাবেন না।

—ভুলে যাবার জো কি! কাল সকালেই তোমার দাদাকে বলব। এখন কটা বেজেছে? বল কি, পৌনে বারো! তাই তো, বাড়ি যাব কি করে, ট্রাম বাস সব তো বন্ধ।

ঝিণ্টু বলল, কিচ্ছু ভাববেন না সার, একবারটি শুয়ে পড়ে চোখ বুজুন তো।

যোগীন বাঁড়ুজ্যে সুবোধ শিশুর ন্যায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন। শিবামুখী চিমটের আওয়াজ শুনে পিশাচ আবার

এল। ঝিন্টু তাকে ইশারায় আজ্ঞা দিল—এঁকে নিজের বাড়িতে পেঁৗছে দাও।

বারোটা বাজল। সরসী বলল, দাদা বউদি এখনই এসে পড়বে। যাই, গহনাগুলো খুলে ফেলি গে, টাকার থলিগুলোও তুলে রাখতে হবে। তোর মোটে বুদ্ধি নেই, টাকা না চেয়ে নোট চাইলি না কেন? ঝিন্টু বাবা আমার, কোনও কথা কাকেও বলিস নি।

—না না, বলব কেন। এই যা, ঢুণ্ঢুদাসের কাছে একটা বেঁজি চেয়ে নিতে ভুলে গেছি! ইস্কুলের দারোয়ান রামভজনের কেমন চমৎকার একটি আছে, খুব পোষা, কাঁধের ওপর নেপটে থাকে।

—ভাবিস নি খোকা, যত বেঁজি চাস তোর পিসেমশাই তোকে কিনে দেবে। তুই আর জ্বর গায়ে জাগিস নি, শুয়ে পড়।

—কোথায় জ্বর! সে তো ঢুণ্ঢুদাসকে দেখেই সেরে গেছে।

—হ্যাঁরে খোকা, আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো? সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি গহনা আর টাকা সব উড়ে গেছে?

—গেলই বা উড়ে। যোগীনবাবু আবার গড়িয়ে দেবে, টাকাও দেবে।

—যোগীনবাবুও যদি উড়ে যায়?

—যাক গে উড়ে। তুমি এই মটরভাজা একটু খেয়ে দেখ না, কেমন কুড়কুড়ে। বেশ করে চিবিয়ে গিলে ফেল, তা হলে কিছুতেই উড়ে যেতে পারবে না।

১৩৬২

দ্বান্দ্বিক কবিতা

ভূপতি মুখুজ্যে এই আড্ডার নিয়মিত সদস্য নয়, মাঝে মাঝে আসে। সে কোন্নগরে থাকে কিন্তু কলকাতার সব খবর রাখে। আমুদে লোক, বয়স চল্লিশ হলেও ভাঁড়ামি করতে তার বাধে না।

আজ সন্ধ্যায় যতীশ মিত্রের আড্ডাঘরে ঢুকেই ভূপতি সেকেলে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার ভঙ্গীতে সুর করে হাত নেড়ে বলল,

শুন ন-গ-র-বা-আ-সি-গণ,
আশ্চর্য খবর মহা সেন্‌সে-শন।
শুন ন-গ-র—

বৃদ্ধ পিনাকী সর্বজ্ঞ এখানে রোজ চা খেতে আসেন। বললেন, ফাজলামি রাখ, যা বলবার সোজা ভাষায় বল।

ভূপতি আবার সুর করে বলল,

আমাদের কবি ধূর্জটিচরণ
ছিরু ঘোষকে করেছে গুরু বরণ,
মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠে নিয়েছে শরণ,
সব সম্পত্তি নাকি করিবে অর্পণ।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, গাঁজা টেনে এসেছ নাকি? ছিরু ঘোষ লোকটা কে?

ভূপতি বলল, জানেন না? কমরেড শ্রীদাম ঘোষ, সম্প্রতি মঠস্বামী শ্রীদাম মহারাজ হয়েছেন।

—ওকে চিনি না, তবে তোমাদের কবি ধূর্জটিচরণকে বার কতক দেখেছি বটে, বছর দুই আগে যতীশের কাছে মাঝে মাঝে আসত। মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠ আবার কি? জান নাকি যতীশ?

যতীশ মিত্র বলল, একটু আধটু জানি, কমরেড ছিরুর সঙ্গে এককালে আলাপ ছিল। আর ধূর্জটির সঙ্গে তো এক ক্লাসে পড়েছি, কিন্তু সে যে ছিরুর শিষ্য হয়েছে তা জানতুম না।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠ নামটা যেন সোনার পাথরবাটি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব। মার্ক্সের শিষ্যরা তো ঘোর নাস্তিক, তারা আবার বৈষ্ণব হল কবে?

যতীশ বলল, কালক্রমে সবই বদলে যায়। ডবলু সি বনার্জির সময় কংগ্রেস যা ছিল এখনও কি তাই আছে? লেনিন আর ট্রট্স্কির পলিসি কি এখনও বজায় আছে? বেঁচে থাকলে আরও কত কি দেখবেন সর্বজ্ঞ মশাই। তান্ত্রিক ফাসিজ্ম, মার্কিন অদ্বৈতবাদ, ভারতীয় সর্বাস্তিবাদ—

উপেন দত্ত বলল, হেঁয়ালি রাখ যতীশ-দা, মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠ ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে দাও।

যতীশ বলল, সব বৃত্তান্ত আমার জানা নেই, যতটুকু জানি তাই বলছি। ছেলেবেলা থেকেই ছিরুর একটু কমরেডী মতিগতি ছিল। কলেজ ছাড়ার পর সে একজন উগ্র সাম্যবাদী হয়ে উঠল, প্রতিপত্তিও খুব হল। শুনেছি শেষকালে সে ওদের দলের

একজন কর্তা ব্যক্তি হয়েছিল। কিন্তু ছিরুর সঙ্গে পার্টির লোকদের মতের মিল হল না। তাদের গুরু রাশিয়া, কিন্তু ছিরু বলল, সব দেশে একই ব্যবস্থা চলতে পারে না। ভারতের লোক হচ্ছে ধর্মপ্রাণ, ধর্ম বাদ দিয়ে কোনও রাজনীতি এখানে দাঁড়াতেই পারে না। এই দেখ, বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা-দুর্গা বানিয়েছিলেন। আমাদের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের এক হাতে থাকত বোমা, আর এক হাতে গীতা। দেশবন্ধু কৃষ্ণপ্রেমী হয়ে পড়লেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তান্ত্রিক সাধনা করতেন। শ্রীঅরবিন্দ লাইফ ডিভাইন নিয়ে মেতে রইলেন। গান্ধীজী রঘুপতি রাঘবের নাম কীর্তন করতেন। গুরুজী গোলবালকরও রামভক্ত, যদিও তাঁর ভক্তি একটু দুসরী কিসিম কী। কমিউনিজ্‌ম এদেশে জুত করতে পারছে না তার কারণ এর কোনও ঐশ্বরিক অবলম্বন নেই। মহান স্তালিন, মহান মাও-সে-তুং বলে যতই চেঁচাও তাতে প্রাণ সাড়া দেবে না। ভক্তি চাই, অবতার চাই। সাম্যবাদকে ঢেলে সাজতে হবে। ছিরু ঘোষ বিগড়ে গেছে দেখে পার্টির কর্তারা তাকে দল থেকে দূর করে দিল। কিন্তু ছিরু দমবার পাত্র নয়, অনেক বড়লোক ভক্ত জুটিয়েছে, তাদের টাকায় মার্ক্সীয় বৈষ্ণব মঠ প্রতিষ্ঠা করে নিজে মঠাধীশ শ্রীদাম মহারাজ হয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা তার পৃষ্ঠপোষক, শীঘ্রই সে অবতার হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের ধূর্জটি কবির তো কোনও দিন ধর্মে বা পলিটিক্সে মতি ছিল না, সে কি করে ছিরুর কবলে পড়ল বুঝতে পারছি না।

ভূপতি বলল, ছিরুর সব খবর আমি রাখি, ধূর্জটিরও নাড়ী নক্ষত্র জানি, সে দূর সম্পর্কে আমার শালা হয়। ছেলেবেলা থেকেই ধূর্জটি কবিতা লিখত, তার কবিখ্যাতি আছে, গোটাকতক বইও আছে। অনেক কবি যেমন করে থাকে সেই রকম ধূর্জটিও একটি মানসী প্রিয়া খাড়া করে তার উদ্দেশে কবিতা লিখত।

উপেন দত্ত বলল, এর মানে আমি মোটেই বুঝতে পারি না। আমাদের ছোট বড় বিবাহিত অবিবাহিত যত কবি আছেন তাঁদের অনেকে একটি মনগড়া মেয়ের উদ্দেশে কবিতা লেখেন। এতে তাঁদের কি লাভ হয়?

যতীশ বলল, শাস্ত্রে আছে, সাধকদের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা। কবিরা তেমনি প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য একটি পরমা প্রেয়সীর কল্পনা করেন। এ একরকম তান্ত্রিক নায়িকাসাধনা।

পিনাকী বললেন, বাজে কথা। একে বলে মনে মনে ব্যভি-চার। যাদের স্ত্রী নেই কিংবা স্ত্রী পছন্দ হয় না সেই সব কবিই মনগড়া নারীর সঙ্গে প্রেম করে।

উপেন বলল, সর্বজ্ঞ মশাই যা বললেন তা হয়তো ঠিক, যতীশ-দার কথাও ঠিক। কিন্তু কবিদের এইরকম প্রেমলীলার জন্যে তাদের স্ত্রীরা চটে না কেন? মেয়ে কবিও তো ঢের আছে, তারা তো মনগড়া প্রেমিকের উদ্দেশে কবিতা লেখে না।

যতীশ বলল, কেউ কেউ লেখে বইকি। তবে খুব কম, কারণ মনোবাক্যে সতীধর্ম পালন করার সংস্কার এদেশের বেশীর

ভাগ মেয়ের এখনও আছে। পুরুষদের সে বালাই নেই। কবিদের স্ত্রীরা মনে করে, ছাগলে কি না খায়, কবিরা কি না লেখে, তাতে দোষ ধরলে চলে না।

ভূপতি বলল, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে গণ্ডগোল বাধে, স্বামী-স্ত্রীর উপার্জনব্যাপারে ওলটপালট ঘটে, যেমন ধূর্জটিদের হয়েছে। ওদের সব খবরই আমি রাখি, বলছি শোন।—

ধূর্জটি যখন ছোট তখনই তার বাপ মা মারা যান, এক মামা তাকে নিজের কাছে রেখে পালন করেন। শিক্ষা শেষ করে ধূর্জটি তার মামার কারবারে যোগ দিল, দেদার কবিতাও লিখতে লাগল। তার পর তার বিয়ে হল। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন লিখে-ছেন ধূর্জটির ঠিক সেই রকম মনে হল—ভাবলাম বাহা বাহা রে, কি রকম যে হয়ে গেলাম বলব তাহা কাহারে। এতদিন সে কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে কবিতা লিখত, এখন জীবন্ত প্রিয়ার ওপর লিখতে লাগল। বউএর শংকরী নামটা সেকেলে বলে ধূর্জটি বদলাতে চেয়েছিল, কিন্তু বউ রাজী হল না, বলল, ও আমার জেঠামশায়ের দেওয়া নাম, বদলানো চলবে না; তোমার নামটাই বা কি এমন মধুর? অগত্যা সেকেলে শংকরীকেই সম্বোধন করে ধূর্জটি লিখতে লাগল—নন্দনের উর্বশী, পাতাল-পুরীর রাজকন্যা, সাগর থেকে ওঠা ভিনস, আমার হৃদয় যা চায় তুমি ঠিক তাই গো, এই সব।

কিছু কাল এই রকমে চলল, তার পর ক্রমশ ধূর্জটির হুঁশ হল মানসী প্রিয়ার সঙ্গে তার বিবাহিত প্রিয়ার মিল নেই। শংকরী কাব্যরস বোঝে না, তার মনে রোমান্স নেই। বিয়ের সময় সে আত্মীয় আর বন্ধুদের কাছ থেকে বিস্তর সস্তা উপহার পেয়েছিল। তার উদ্দেশে লেখা ধূর্জটির কবিতাগুলোও যেন তার কাছে মামুলী উপহারের শামিল। সে সংসারের কাজ আর তার নবজাত খোকাকে নিয়েই ব্যস্ত। ধূর্জটি বেচারা আবার তার কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে ছুটিয়ে কবিতা লিখতে লাগল আর শংকরী সাংসারিক কাজে ডুবে রইল।

তার পর হাঙ্গামা বাধাল বিশাখা। সে আমার খুড়তুতো শালী, অত্যন্ত ফন্দিবাজ মেয়ে, ধূর্জটির বউ শংকরীর সঙ্গে এক কলেজে পড়েছিল। তার স্বামী নরেশ এঞ্জিনিয়ার, আগে কাঁচড়াপাড়ায় কাজ করত, তার পর বদলী হয়ে কলকাতায় এল, ধূর্জটির বাড়ির পাশেই বাসা করল। বিশাখাকে কাছে পেয়ে শংকরী খুব খুশী হল।

একদিন বিশাখা বলল, তোমার বর তো একজন বিখ্যাত কবি। আজকাল কবিতার বই কেউ কেনে না, কিন্তু ধূর্জটি-বাবুর বই বেশ বিক্রি হয় শুনেছি। আচ্ছা, উনি কার উদ্দেশে অত প্রেমের কবিতা লেখেন? তোমার জন্যে নিশ্চয় নয়, তা হলে 'স্বপ্নে দেখা অচিন প্রিয়া' এই সব লিখতেন না।

শংকরী বলল, কারও উদ্দেশে লেখে না। কবিরা খেয়ালী লোক, মনগড়া একটা কিছু খাড়া করে তার উদ্দেশে লেখে।

—সত্যি বা মনগড়া যাই হক, তোমার রাগ হয় না?

—ও সব আমি গ্রাহ্য করি না।

—এ তোমার ভারী অন্যায়, এর পর পস্তাতে হবে। আর দেরি নয়, এখন থেকে স্টেপ নাও।

—কি করতে বল তুমি?

—একটা মনগড়া পুরুষের উদ্দেশে তুমিও কবিতা লিখতে শুরু কর।

—রাম বল। কবিতা লেখা আমার আসে না, আর লিখলেই বা ছাপবে কে?

—সে তুমি ভেবো না। 'নিস্যান্দিনী' পত্রিকা দেখেছ তো? তার সম্পাদক তরণী সেন আমার দেওর রমেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোমার লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। আর, কবিতা লেখা খুব সোজা, দেদার চুরি করবে, ওখান থেকে এক লাইন এখান থেকে এক লাইন নেবে, তার সঙ্গে নিজের কিছু জুড়ে দেবে। এখন গদ্য কবিতার যুগ, মিলের ঝঞ্ঝাট নেই, যা খুশি এলোমেলো করে সাজিয়ে দিলেই গদ্য কবিতা হয়ে যায়।

বিশাখার জেদের ফলে শংকরী রাজী হল। দুজনে মিলে একটা কবিতা খাড়া করল, বিশাখার দেওর রমেশ সেটা তরণী সেনের কাছে নিয়ে গেল।

তরণী বলল, আরে ছ্যা, একে কি কবিতা বলে! 'ওগো আমার বঁধু, তুমি ডুমুর ফুলের মধু!' এ রকম সেকেলে কাঁচা লেখা ছাপলে আমার পত্রিকা কেউ পড়বে না।

রমেশ তার বউদিদির সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরী হয়েই গিয়েছিল। বলল, আচ্ছা তরণী, তোমার পত্রিকার লাভ কত হয়?

— লাভ কোথায়, এখনও ঘর থেকে গচ্চা দিতে হয়।

— তবে বলি শোন। প্রতি মাসে আমি পাঁচ-ছটা কবিতা আনব, প্রত্যেকটি ছাপবার জন্যে পাঁচ টাকা হিসেবে দেব। তাতে পঁচিশ-তিরিশ টাকা পাবে। রাজী আছ?

তরণী সেন বলল, তা মন্দ কি, কাগজের খরচটা তো উঠবে। টাকা পেলে প্রতি সংখ্যায় দশটা কবিতা ছাপতে রাজী আছি। কিন্তু দেখো ভাই, নিতান্ত রাবিশ না হয়।

— আরে না না। শংকরী দেবীর নামে ছাপা হবে বটে কিন্তু বেশীর ভাগ আমার বউদিই লিখবেন। তাঁর হাত খুব পাকা।

নিস্যান্দিনী পত্রিকায় শংকরী দেবীর নামে কবিতা ছাপা হতে লাগল। তা দেখে ধূর্জটির মনে কিঞ্চিৎ কৌতুক আর করুণার উদয় হল। সে তার স্ত্রীকে বলল, বেশ তো, শখ যখন হয়েছে লিখতে থাক। এখন বড্ড কাঁচা, লিখতে লিখতে হাত পাকতে পারে। চাও তো আমি সংশোধন করে দিতে পারি। শংকরী বলল, না না, তোমার কিছু করতে হবে না, যা পারি আমিই লিখব। বদনাম হয় তো আমারই হবে, তোমার ক্ষতি হবে না।

শংকরী দেবীর কবিতা ক্রমশ কাঁচা থেকে পাকা, ঠাণ্ডা থেকে গরম, এবং গরম থেকে গরমতর হতে লাগল। পাঠকরা বলল, কি চমৎকার! একজন আধুনিক সমালোচক লিখলেন — এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসঘন কাব্যমধুরিমা, নারীর অন্তর্নিহিত

ফল্‌গুধারার স্বত উৎসারিত উৎস, এর তুলনা নেই। নিস্যান্দিনী পত্রিকার কাটতি হু হু করে বেড়ে গেল। তরণী সেনকে রমেশ বলল, আর টাকা দিচ্ছি না, এখন থেকে তুমিই দেবে, প্রতি কবিতায় দশ টাকা। 'প্রগামিনী'র সম্পাদক অনুকূল চৌধুরী তাই দেবেন বলেছেন। তরণী বলল, আচ্ছা আচ্ছা, শংকরী দেবী টাকা না হয় নাই দেবেন। কিন্তু দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য এখনও আমাদের হয় নি, আরও কিছু দিন সবুর করতে হবে।

উপেন দত্ত বলল, শংকরী দেবীর কবিতা পড়েছি বলে মনে হয় না। আপিসের যা খাটুনি, সাহিত্য চর্চার ফুরসতই নেই। এই আড্ডায় এসে পাঁচ জনের মুখে যা একটু শুনতে পাই। আচ্ছা যতীশ-দা, তোমার কাছে নিস্যান্দিনী নেই?

যতীশ বলল, আমি পয়সা দিয়ে রাবিশ কিনি না।

ভূপতি বলল, শংকরী দেবীর কবিতা শুনতে চাও? কিছু কিছু আমার মনে আছে, বলছি শোন। একটা হচ্ছে এই রকম —

আমি চিনি গো চিনি তোমারে,
তুমি থাক মহাপ্রাচীরের এপারে।
কি মিষ্টি তোমার আধো আধো বুলি,
রুশকে বল লুশ, দু টাকাকে তু লুপি।
ওগো লাল চীনের জঙ্গী জওআন,
তোমার নয়ন বাঁকা, বর্ণ স্বর্ণচাঁপা,
সিল্কমসৃণ শ্যাময় লেদার তোমার চামড়া,
ওই নির্লোম বুকে ঠাঁই চাই ঠাঁই চাই।

আর একটা বলি শোন —

ও বিদেশী পাখতুনিস্তানবাসী,
তাগড়া জাক্কাখেল, আমি তোমায় ভালবাসি।
নর্ডিক নীল তোমার সুর্মা পরা চোখ,
সেমেটিক নাকের নীচে মোটা ছাঁটা গোঁফ।
তোমার লোমজঙ্গল বুকে টেনে নাও আমাকে,
ক্র্যাংক-শাফ্‌টের মতন দুই হাতে জাপটে ধর,
মড়মড়িয়ে ভেঙে দাও আমার পাঁজরা,
পিষে ফেল, পিষে ফেল।

এই সব কবিতা নিস্যান্দিনী পত্রিকায় দেদার ছাপা হতে লাগল। 'কাঙ্ক্ষার ঝংকার' নাম দিয়ে শংকরীর একটা কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হল, তিন মাসের মধ্যেই তিনটে সংস্করণ ফুরিয়ে গেল। ধূর্জটি নিজের রচনা নিয়েই মেতে থাকত, তার বউ কি লিখছে, তা পড়ে লোকে কি বলছে, এ সব খবর রাখত না। একদিন তার এক সাহিত্যিক বন্ধু একখানা কাঙ্ক্ষার ঝংকার দেখিয়ে বলল, ওহে ধূর্জটি, এই শংকরী দেবী তোমারই গৃহিণী তো? ওঃ, ভদ্র মহিলা কি সব অদ্ভুত কবিতা লিখছেন, রেগুলার হট স্টফ। পড়ে তোমার মনে একটু ইয়ে হয় না? আমাদের সাইকোলজিস্ট প্রফেসার ভড় বলছিলেন, এ হচ্ছে উদ্দাম লিবিডো।

ধূর্জটির ভাবনা হল। স্ত্রীর কাছ থেকে তার কবিতার বই চেয়ে নিয়ে খুব মন দিয়ে পড়ল। তার মেজাজ বিগড়ে গেল। শংকরীকে বলল, এ সব কি ছাই ভস্ম লেখা হচ্ছে? লোকে যে

ছি ছি করছে।

শংকরী বলল, করুক গে ছি ছি, খুব বিক্রি তো হচ্ছে। আরও একখানা বই ছাপবার জন্যে প্রেসে দিয়েছি।

মাথা নেড়ে ধূর্জটি বলল, ওসব চলবে না বলছি।

—বা রে মজা! তুমি লিখলে দোষ হয় না, আর আমার বেলা দোষ! 'ওগো সর্বনাশী, আমি ভালবাসি তোমার ঠোঁটের ওই মোনা-লিসা হাসি'—তুমি এই সব ছাই ভস্ম লেখ কেন?

—আমার সঙ্গে তোমার তুলনা! কাল্পনিক রমণীর ওপর কবিতা লিখলে পুরুষের দোষ হয় না, কিন্তু মেয়েদের সে রকম লেখা অতি গর্হিত।

—বেশ, তুমি কবিতা লেখা বন্ধ কর, তোমার সব বই পুড়িয়ে ফেল, আমিও তাই করব।

ধূর্জটি রেগে আগুন হয়ে বেরিয়ে গেল।

উপেন দত্ত বলল, যত নষ্টের গোড়া আপনার শালী বিশাখা। খামকা এই ঝগড়া বাধিয়ে তাঁর কি লাভ হল?

ভূপতি বলল, হুঁ, বিশাখার স্বামী নরেশও তাই বলেছে, খুব ধমকও দিয়েছে। তার পর শোন। শংকরীর কাছে সব কথা শুনে বিশাখা তার সখীর হয়ে লড়তে গেল। ধূর্জটিকে বলল, আপনার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি? ঘরে অমন সুন্দরী বউ থাকতে কোথাকার কে অচিন প্রিয়ার উদ্দেশে আপনি কবিতা লেখেন কোন্ আক্কেলে? তাতে শংকরীর রাগ হবে না? শোধ তোলবার জন্যে সেও যদি ওই রকম লেখে তাতে অন্যায়টা কি

মশাই ?

ধূর্জটি বলল, তা বলে চীনেম্যান আর কাবলীওলার উদ্দেশে প্রেমের কবিতা লিখবে ?

—আচ্ছা আচ্ছা, এখন থেকে না হয় বাঙালী তরুণদের উদ্দেশেই লিখবে। কিন্তু তার চাইতে ভাল—আপনি আজ থেকে নিজের গিন্নীর নামে কবিতা লিখুন, যেমন প্রথম প্রথম লিখতেন। আর সেও আপনার নামে লিখুক। এক বাড়িতে যখন বাস করছেন, দুজনেই যখন কবি, তখন রেসিপ্রোসিটি না হলে চলবে কেন ?

ধূর্জটি কিন্তু বুঝল না, তার মন অস্থির হয়ে উঠল। ভাল করে খায় না, ঘুময় না, আপিসের কাজেও মন দেয় না। এই অবস্থায় একদিন ছিরু ঘোষের সঙ্গে তার দেখা হল। ছিরু তখন মঠাধীশ মণ্ডলেশ্বর হাজার-আট-শ্রী হিজ হোলিনেস শ্রীদাম মহারাজ। দশ আঙুলের দশটা হীরের আংটি, বাসন্তী রঙের সিল্ক ভিন্ন পরে না। সে মিষ্টি মিষ্টি করে অনেক তত্ত্বকথা শোনাল, ধূর্জটি মুগ্ধ হল। ছিরু বলল, কোনও চিন্তা নেই, তোমার সমস্ত ক্ষোভ আমি দূর করে দেব, তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে যাতে পরমা শান্তি পাও তার ব্যবস্থা করব।

তার পর ছিরু ধূর্জটিকে যে লেকচারটি দিল তার সার মর্ম এই।—তোমাদের এই দাম্পত্যকলহ মার্ক্স-কথিত দ্বান্দ্বিক নিয়মেই হয়েছে। তুমি কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে কবিতা লেখ, তাতে তোমার স্ত্রী চটে উঠল—এ হল থিসিস। তার প্রতিক্রিয়া

স্বরূপ তোমার স্ত্রী কাল্পনিক পুরুষের উদ্দেশে লিখতে লাগল, তুমি চটে উঠলে—এ হল অ্যান্টিথিসিস। এখন দরকার সিন্থিসিস, তা হলেই সব মিটে যাবে। তোমরা দুজনে আমার মঠে চলে এস, নিত্য সৎকথা শোন, আর এই দুখানা বই দিচ্ছি, ভাল করে প'ড়ো—প্রেমসিন্ধুতরঙ্গভঙ্গিমা, এবং ডায়ালেক্‌টিক্যাল বৈষ্ণভিজ্‌ম। পড়লে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি আর শ্রীমার্ক্‌সে অচলা নিষ্ঠা হবে। তার পর ধূর্জটি আর তার স্ত্রী মার্ক্‌সীয় বৈষ্ণব মঠে চলে গেল।

যতীশ বলল, ধূর্জটি বোকা নয়, তবে কবিরা বড় সেণ্টিমেণ্টাল হয়, ভাবের ঝোঁকে অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার স্ত্রীও শুনেছি খুব চালাক মেয়ে। আমার বিশ্বাস ওরা বেশী দিন মঠে টিকতে পারবে না, শীঘ্রই অরুচি হয়ে যাবে।

ভূপতি মুখুজ্যে উঠে পড়ে বলল, তোমরা ব'স, আমি চললুম। কর্তাবাবুর খেয়াল হয়েছে কূর্মঅবতার যাত্রা শুনবেন, তারই বায়না দিতে শিবপুর যেতে হবে। যে ছোকরা কূর্ম সাজে তার নাচ নাকি অতি অপূর্ব।

সাত দিন পরে ভূপতি আবার আড্ডায় উপস্থিত হয়ে হাত নেড়ে সুর করে, বলল,

শুন ন-গ-র-বা-আ-সি-গণ,
বিচিত্র খবর চিত্তচমৎকরণ।

আমাদের মিসেস ধূর্জটিচরণ
ছিরু ঘোষকে করেছেন দংশন,
আর ধূর্জটি দিয়েছে বেদম পিটন।
স্বামী স্ত্রী করেছে স্বগৃহে গমন,
আর ছিরুর হাত হয়েছে সেপ্‌টিক ভীষণ,
আর-জি-করে হবে অ্যাম্পুটেশন।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, আঃ, ভাঁড়ামি রাখ, সমস্ত কথা খোলসা করে বল।

ভূপতি বলল, খোলসা করেই তো বললুম। আচ্ছা ছন্দোবন্ধ বাক্য যদি আপনাদের বোধগম্য না হয় তবে গদ্যতেই বলছি। ধূর্জটি আর তার স্ত্রী ফিরে এসেছে শুনে আজ সকালে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বিশ্রী ব্যাপার। মঠে যাবার দিন কতক পরে ছিরু মহারাজ ওদের বলল, এখানে স্বামী-স্ত্রীর একত্র থাকা নিষিদ্ধ, মেয়েরা আর পুরুষরা আলাদা আলাদা মহলে বাস করবে, নতুবা সাধনার বিঘ্ন হবে। শ্যামসুন্দরই একমাত্র পুরুষ, শ্রীরাধাই একমাত্র নারী। স্ত্রীপুরুষ সকলকেই রাধা-ভাবে ভাবিত হতে হবে, সেই হল আসল কমিউনিজ্‌ম। তার পর একদিন শংকরীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছিরু বলল, শ্যাম সে পুরুষোত্তম, পতি সে পুরুষাধম। আমার দেহেই শ্যামের অধিষ্ঠান হয়েছে। শ্রীরাধে, তুমি আমাকে ভজনা কর। হাত ধরে টানাটানি করতেই শংকরী চিৎকার করে উঠল, আর ছিরুর ডান হাতে এক ভীষণ কামড় বসিয়ে দিল। চিৎকার শুনে ধূর্জটি ছুটে এসে ছিরুকে

বেদম কিল চড় লাথি লাগাল। মঠে মহা হইচই, ধূর্জটি আর তার স্ত্রী সোজা বাড়ি চলে গেল। তাদের মিটমাট হয়ে গেছে। শুনলুম ধূর্জটি কবিতা ছেড়ে দিয়ে সরল বীজগণিত রচনা করবে, আর শংকরী রবিবারের কাগজে নতুন রান্না লিখবে — কাঁকড়ার কচুরি, পেঁয়াজের পায়েস, এই সব।

যতীশ বলল, এই ব্যাপারের পর ছিরুর ভক্তরা বিগড়ে যায় নি?

— তা কেন যাবে, অবতারদের সবই তো লীলাখেলা।

— ছিরুর হাত সত্যিই অ্যাম্পুটেট করবে নাকি?

— ডাক্তারের যদি কর্তব্যজ্ঞান থাকে তবে নিশ্চয়ই করবে।

১৩৬২

ধনু মামার হাসি

ভোলানাথ ছিল আমাদের ক্লাসের ছেলেদের সর্দার। তার বয়েস সকলের চাইতে বেশী, পর পর তিন বৎসর ফেল করে ক্লাস নাইনে স্থায়ী হয়ে আছে। তার সঙ্গেই আমার বেশী ভাব ছিল।

আমাদের শহরটা বড় নয়, মোটে একটি সিনেমা। মাঝে মাঝে ফুটবল ম্যাচ হত, পুজোর সময় থিয়েটার হত, সরস্বতী পুজোও জাঁকিয়ে হত। এসব ছাড়া আমাদের ফুর্তির অন্য উপায় ছিল না। একদিন হেডমাস্টার বললেন, কাল শনিবার ছুটির পর তোরা থাকবি, স্বামী ব্যোমপ্রকাশজী এসেছেন, তাঁর লেকচার শুনবি।

নীরস হিন্দী বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ আমাদের ছিল না, কিন্তু খোলা মাঠে দল বেঁধে বসাতেও একটা মজা আছে। ব্যোমপ্রকাশ এক ঘণ্টা ধরে সদুপদেশ দিলেন। চুরি, মিথ্যা কথা, অবাধ্যতা প্রভৃতি কুকর্মের পরিণাম, পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার, প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলে পরিশেষে একটি মন্ত্র সর্বদা আমাদের ইয়াদ রাখতে বললেন — নেকী করনা ঔর বদী ছোড়না, অর্থাৎ ভাল কাজ করবে আর মন্দ কাজ ছাড়বে।

বক্তৃতা শেষ হলে আমরা সকলে খুব হাততালি দিলাম। ভোলা আমার পাশেই বসেছিল, হঠাৎ সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিশ্রী রকম হেসে উঠল। আমি বললাম, ওকি রে?

ভোলা বলল, একটু হেসে নিলাম। এই নতুন হাসিটা প্র্যাকটিস করছি, ধনু মামার কাছে শিখেছি।

— ধনু মামা আবার কে?

— আমার দিদিমার পিসেমশাই ধনঞ্জয় দত্ত, খুব বুড়ো মানুষ। মা তাঁকে বলে ধনু দাদা, তাই তিনি আমার মামা হন। দশ দিন হল এসেছেন, আমাদের বাড়িতেই বরাবর থাকবেন। চমৎকার হাসেন ধনু মামা, কিন্তু বেশী নয়, খুব যখন ফুর্তি হয় তখন।

— তোর তা শেখবার কি দরকার?

— নতুন বিদ্যে শিখতে হয় রে। তুইও তো মুখে দুটো আঙুল পুরে সিটি বাজানো শিখছিস। আমার হাসিটা এখনও ঠিক হচ্ছে না, সুর দুরস্ত করতে আরও সাত দিন লাগবে। চল্ না আমাদের বাড়ি, ধনু মামার হাসি শুনে আসবি। একটা চার পয়সা দামের ছোট খাতা কিনে নে। ধনু মামা যদি জিজ্ঞেস করে— কি করতে এসেছ হে ছোকরা? তুই অমনি খাতা খানা এগিয়ে দিয়ে বলবি— আজ্ঞে, একটি বাণী নিতে এসেছি।

মোড়ের দোকান থেকে খাতা কিনে ভোলার সঙ্গে চললাম। তার বাপ ঠিকাদারি করেন, বেশীর ভাগ বাইরেই ঘুরে বেড়ান। বাড়িতে তার মা আছেন, দুটো ছোট ভাইও আছে। ভোলার কাছে শুনলাম, ধনঞ্জয় দত্তর তিন কুলে কেউ নেই, কিন্তু বুড়োর নাকি

বিস্তর টাকা আছে। তিনি ওদের বাড়িতে স্থায়ী হয়ে বাস করবেন এতে ভোলার বাবা আর মা খুব খুশী হয়েছেন।

ধন্দু মামা রোগা বেঁটে মানুষ, কালো রং, তোবড়া গাল, আসল বা নকল কোনও দাঁত নেই। সাদা চুল, খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি গোঁফ, বোধ হয় সাত দিন নাপিতের হাত পড়ে নি। তাঁর শোবার ঘরে তক্তপোশে উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন, ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে।

আমি প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। ভোলা পরিচয় দিল — এ আমার বন্ধু রামেশ্বর, এক ক্লাসে পড়ে।

ধন্দু মামা কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাঙের মতন মোটা গলায় বললেন, কি মতলবে এসেছিস রে?

খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, আজ্ঞে, বাণী নিতে।

— বাণী? সে আবার কি?

ভোলা আমার হয়ে উত্তর দিল, বাণী জানেন না? সদুপদেশ আর কি, যাতে এর আখেরে ভাল হয় সে রকম কিছু কথা আপনার কাছে চাচ্ছে।

ধন্দু মামার ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন, মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে, সদা সত্য কহিবে, চুরি করিবে না — এই সব তো?

আমি বললাম, আজ্ঞে হাঁ, ওই রকম যা হক কিছু।

ধন্দু মামা বললেন, রাত্তিরে ভাল দেখতে পাই না, হাতও কাঁপে।

একটা কবিতা বলছি, তুই লিখে নে, নীচে আমি দস্তখত করে দেব। লেখ্‌ — পরের ধন লইবে না, তাহাতে বিপদ; চোরের ধন লইতে পার, অতি নিরাপদ।

অদ্ভুত বাণী শুনে আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ধনু মামা বললেন, কি রে, পছন্দ হল না বুঝি?

ভয়ে ভয়ে বললাম, আপনি ঠাট্টা করছেন সার।

ধনু মামা মাথাটি পিছনে হেলিয়ে চোখ মিটমিট করে উপর দিকে চাইলেন। তাঁর বদনমণ্ডলের সবটা কুঁচকে গেল এবং তাতে যেন তরঙ্গ উঠতে লাগল। তার পর মুখ থেকে বিকট হাসির আওয়াজ বেরুল — খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক। আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ভোলা চুপি চুপি বলল, শুনলি তো?

ধনু মামা বললেন, এই ভোলা, একে আমার কাছে এনেছিস কেন রে? এ তো দেখছি ভাল ছেলে, তোর মতন বকাট নয়। আমার কথা শুনলে এর স্বভাব বিগড়ে যাবে।

ভোলা বলল, আপনি জানেন না ধনু মামা, এই রামেশ্বর হচ্ছে ওয়েট ক্যাট, মানে ভিজে বেরাল। আপনি নির্ভয়ে একে উপদেশ দিতে পারেন।

ধনু মামা বললেন, উপদেশ তো তোরা বিস্তর শুনেছিস, আমি আর বেশী কি বলব। তবে যেটুকু আমি আবিষ্কার করেছি তা তো ওকেই বলেই দিলাম।

সাহস পেয়ে আমি বললাম, কি করে আবিষ্কার করলেন বলুন না মামাবাবু।

প্রসন্ন মুখে ধন্ মামা বললেন, জানতে চাস? আচ্ছা, বলছি। তোরা তো সোজা ইস্কুল থেকে এসেছিস, জলটল খাস নি তো? ওরে ভোলা, তোর মার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে চট করে তিতু ময়রার দোকান থেকে এক পো গজা আর এক পো জিলিপি কিনে আন।

ভোলা খাবার আনতে গেল। ধন্ মামা আমাকে বললেন, খাবার আসুক, তোরা খেতে খেতে আমার গল্প শুনবি। ততক্ষণ বরং তুই আমার একটু পা টিপে দে।

আমি ধন্ মামার পদসেবা করতে লাগলাম। একটু পরেই ভোলা খাবারের ঠোঙা নিয়ে এল, বাড়ির ভিতর থেকে দু গেলাস জলও আনল। ধন্ মামা বললেন, খেতে লেগে যা তোরা। না না, আমার জন্যে রাখতে হবে না, আমি ও সব খাই না।

গজায় কামড় দিয়ে আমি বললাম, এইবার বলুন মামাবাবু।

ধন্ মামা বললেন, দেখ্, যা বলব তা ঠিক তত্ত্বকথা নয়। আর কেউ হলে এসব রহস্য প্রকাশ করত না, কিন্তু আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না। বয়েস বিস্তর হয়েছে, ডাক্তার বলেছে রক্তের চাপ দু শ চল্লিশ থেকে হঠাৎ এক শ চল্লিশে নেমেছে। লক্ষণ ভাল নয়, বেশ বুঝছি শিগ্গির এক দিন মুখ থুবড়ে পড়ে মরব। ফাদার কনফেসার কাকে বলে জানিস? যে পাদরীর কাছে খ্রীষ্টানরা মাঝে মাঝে নিজের কুকর্ম স্বীকার ক'রে মন হালকা করে, তাকেই বলে।

ভোলা বলল, গল্প শুনেছি—গেঁয়ো লোক গঙ্গাস্নানে

এসেছে, পুরুত তাকে মন্ত্র পড়াচ্ছে—আম্র চুরি জাম্র চুরি, ভাদ্র-মাসে ধান্য চুরি, মন্দ স্থানে রাত্রিযাপন, মদ্যপান আর কুক্কড়া ভক্ষণ, হক্কল পাপ বিমোচন, গঙ্গা গঙ্গা।—সেই রকম নাকি?

—হাঁ। আজ তোরাই আমার ফাদার কনফেসার। আমার ইতিহাসটা বলছি শোন।—

অনেক বছর আগেকার কথা। তখন আমার বয়েস আঠারো-উনিশ, নাম ছিল হাবুলচন্দ্র। লেখাপড়া বেশী শিখি নি, অবস্থা খুব খারাপ, বাড়িতে মা ছাড়া কেউ ছিল না। মারা যাবার আগের দিন মা বললেন, বাবা হাবুল, এই পাড়াগাঁয়ে বেকার বসে থাকিস নি, দহরমগঞ্জে তোর কাকার কাছে যাবি, যা হক একটা হিল্লে লাগিয়ে দেবেন।

মা মারা গেলে দহরমগঞ্জে গেলাম, বেশ বড় জায়গা। কাকা ওখানকার মস্ত কারবারী গয়াপ্রসাদ প্রয়াগদাসের ফার্মে চালান লিখতেন। এই ফার্মের পত্তন করেছিলেন গয়াপ্রসাদ। তিনি গত হলে তাঁর ছেলে প্রয়াগদাস মালিক হন। আমি যখন ওখানে যাই তখন প্রয়াগদাসের বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। গুটিকতক নাবালক ছেলে মেয়ে আছে, দ্বিতীয় পক্ষের একটি স্ত্রীও আছে। প্রয়াগ-দাস বাতে পঙ্গু হয়ে প্রায় বিছানাতেই শুয়ে থাকতেন, অগত্যা তাঁর খুড়তুতো ভাই বৃদ্ধিচাঁদকে ম্যানেজার করে ব্যবসা চালাবার সমস্ত ভার দিয়েছিলেন। বৃদ্ধিচাঁদের বয়েস প্রায় তিরিশ, নিঃসন্তান, স্ত্রী গত হলে আর বিয়ে করেন নি।

সে সময়ে আমার চেহারাটি এমন মর্কটের মতন ছিল না, বেশ নাদ্‌স ন্দ্‌স বেঁটে গড়ন, ফ্লো ফ্লো গাল, একট্ বোকা বোকা ভাব। দেখাত যেন চোদ্দ-পনরো বছরের ছেলে। লোকে বলত, এই হাব্লটা হচ্ছে হাবা গোবা। আমি মনে মনে হাসতাম আর যতটা পারি বোকা সেজে থাকতাম। তাতে লাভও হত। লোকে আমাকে বিশ্বাস করত, অনেক সময় আমার সামনে গ্‌প্ত কথা বলে বসত। কাকা আমাকে ব্দ্ধিচাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, হ্জ্র, আপনাদের আশ্রয়ে ব্ড়ো হয়ে গেছি, আমি আর ক দিন। দয়া করে আমার ভাইপো এই হাব্লচন্দরকে যা হয় একটা কাজ দিন।

ব্দ্ধিচাঁদ আমার ম্খের দিকে চেয়ে একট্ হাসলেন, তার পর পিঠে একটা কিল মেরে বললেন, আরে হাব্ব্, তুই তো বৌরা পাগলা আছিস, কোন কাম করবি? আচ্ছা, এখন তোকে পাঁচ টাকা মাহিনা দিব, আমার খাস আরদালী হয়ে ইধর উধর চিঠ্‌ঠি লিয়ে যাবি। পারবি তো? আমি খ্ব ঘাড় দ্লিয়ে বললাম, জী হ্জ্র, পারব।

তখনই আরদালীর পদে বাহাল হয়ে গেলাম। ব্দ্ধিচাঁদ শৌখিন লোক, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গদিতে বসতেন না, টেবিল চেয়ার আলমারি দিয়ে তাঁর আপিস-ঘর সাজিয়েছিলেন, ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে ডাকতেন? আমার কাজ খ্ব হালকা, ব্দ্ধি-চাঁদের খাস কামরার দরজার পাশে একটা ট্লে বসে থাকতাম, তাঁর ছোটখাটো ফরমাশ খাটতাম, মাঝে মাঝে তাঁর চিঠি বিলি

করতাম। চিঠি বইবার জন্যে তিনি আমাকে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ দিয়েছিলেন।

হাবা গোবা মনে করে সবাই আমাকে ঠাট্টা করত, আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতাম আর বোকার মতন হাসতাম। কিন্তু কান সর্বদা খাড়া থাকত, গুজগুজ ফিসফিস করে কে কি বলছে সব মন দিয়ে শুনতাম। ক্রমশ আমার কানে এল—বুদ্ধিচাঁদ খুব তুখড় কাজের লোক, সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ভাল। কিন্তু হাতটান আছে, ফার্মের টাকা সরিয়ে থাকেন, জুয়ো খেলেন, নেশা করেন, অন্য দোষও আছে।

রামনবমীর দিন ওঁদের নতুন খাতা হত। তার আগের দিন বড় বড় খদ্দেররা তাদের দেনা চুকিয়ে দিত। আমি বাহাল হবার পাঁচ-ছ মাস পরেই ওঁদের বছর কাবার হল, যাকে বলে সাল তামামি। রাত্রি পর্যন্ত কাজ চলবে তাই আমাদের জলখাবারের জন্যে প্রচুর কচৌড়ি আর লাড্ডু আনা হল। অনেক রাত পর্যন্ত টাকা আসতে লাগল, বুদ্ধিচাঁদ তাঁর কামরায় বসে নিজেই নোট আর টাকা গনতি করতে লাগলেন, আমি নোটের বান্ডিল বাঁধতে লাগলাম। চেক খুব কম, খুচরো টাকাও কম, বেশীর ভাগই পাঁচ শ, এক শ, আর দশ টাকার নোট।

রাত এগারোটার সময় কাজ শেষ হল, আমলারা ছুটি পেয়ে চলে গেল। বুদ্ধিচাঁদ আমাকে বললেন, হিসাব মিলাতে আমার কিছু দেরি হবে, হাব্বু তুই দরজায় বসে থাক, আমার কামরায় কাকেও ঢুকতে দিবি না। আর শোন্—এই প্যাকিটটা তোর

কাছে রাখ্, কাল মথুরানাথ মিসিরের কিতাবের দোকানে ফেরত দিয়ে বলবি, এসব জাসুসী কহানী (অর্থাৎ ডিটেকটিভ গল্প) বুদ্ধিচাঁদজী পড়তে চান না, ভক্তমাল গ্রন্থ যদি থাকে তো তাঁকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বইএর প্যাকেটটা আমার চিঠি বিলির ব্যাগে পুরে আমি কামরার বাইরে পাহারায় বসলাম, বুদ্ধিচাঁদ দরজা বন্ধ করে হিসাব মেলাতে লাগলেন। দরজার কবজার কাছে একটু ফাঁক ছিল, তাই দিয়ে আমি উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। ঘরে কেরোসিনের একটা বড় ল্যাম্প জ্বলছে, বুদ্ধিচাঁদ টেবিলের ওপর নোটের বান্ডিলগুলো নাড়াচাড়া করছেন, মাঝে মাঝে একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছেন। তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, একটু পরেই খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ বার হল, যেন খ্যাঁকশেয়াল ডাকছে। তিনি চেক আর খুচরো টাকা লোহার আলমারিতে বন্ধ করলেন, আর সমস্ত নোটের গোছা এক সংগে খবরের কাগজে জড়িয়ে সরু দড়ি দিয়ে বাঁধলেন। তার পর পাশের ঘর থেকে একটা ছোট স্টীল ট্রাংক এনে মেঝেতে রেখে খুললেন। তাতে কাপড় চোপড় রয়েছে।

ঠিক এই সময় আপিস ঘরের সামনের রাস্তায় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। সইস চেঁচিয়ে আমাকে বলল, এ হাব্বু, মাইজী এসেছেন, বুদ্ধিচাঁদজীকে জলদি আসতে বল্।

মাইজী হচ্ছেন কারবারের মালিক প্রয়াগদাসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বুদ্ধিচাঁদ যাকে ভাবীজী অর্থাৎ বউদিদি বলেন। আমি দরজা একটু ফাঁক ক'রে বললাম, হুজুর, মাইজী এসেছেন, আপনাকে

ডাকছেন। বৃদ্ধিচাঁদ বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ, আসবার সময় পেলেন না, এত রাত্রে টাকা চাইতে এসেছেন! কাজের সময় যত সব বখেড়া। আমাকে তো এখনই রওনা হতে হবে, ট্রেনের টাইম হয়ে এল। হাব্বু, তুই ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরে বসে থাক্, কেউ যেন না ঢোকে। আমি ভাবীজীকে বিদায় করে এখনই আসছি।

বৃদ্ধিচাঁদ তাঁর তোরঙ্গের কাপড়ের মধ্যে নোটের বান্ডিলটা গুঁজে দিলেন। ডালা বন্ধ করতে পারলেন না, একটু উঁচু হয়ে রইল। আমাকে বললেন, হাব্বু, তুই তোরঙ্গের উপরে বসে থাক্, আমি তুরন্ত আসছি।

বৃদ্ধিচাঁদ বেরিয়ে যেতেই সিদ্ধিদাতা গণেশ আমাকে বুদ্ধি দিলেন। তাড়াতাড়ি তোরঙ্গ থেকে নোটের বান্ডিলটা বার করে আমার ব্যাগে পুরলাম, আর ব্যাগে যে বইএর প্যাকেট ছিল তা তোরঙ্গে গুঁজে দিলাম। নোটের বাণ্ডিল আর বইএর প্যাকেট আকারে প্রায় সমান ছিল।

একটু পরে বৃদ্ধিচাঁদ ফিরে এলেন। দেখলেন, আমি তোরঙ্গের উপর গট হয়ে বসে আছি, আমার চাপে ডালাটি ঠিক হয়ে বসেছে। ডালা একটু তুলে ভিতরে হাত দিয়ে দেখলেন বাণ্ডিলটা ঠিক আছে কিনা। তার পর চাবি বন্ধ করে বৃদ্ধিচাঁদ ব্যস্ত হয়ে আমাকে বললেন, আমি এখনই বহরমপুর রওনা হচ্ছি, ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে। আর সময় নেই, তুই আমার তোরঙ্গটা স্টেশন পর্যন্ত পেঁৗছে দে।

বৃদ্ধিচাঁদ আপিস ঘরে তালা লাগিয়ে তার চাবিটা আমাকে দিয়ে বললেন, কাল সকালে বৈজনাথবাবুকে দিয়ে আসবি। বৈজনাথ ছিলেন ফার্মের বড়বাবু, দূর সম্পর্কে মালিকের শালা।

আমার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আর বৃদ্ধিচাঁদের তোরঙ্গ মাথায় নিয়ে আমি আগে আগে চললাম, বৃদ্ধিচাঁদ আমার পিছনে চললেন। স্টেশন খুব কাছে। সেখানে পেঁাছে টিকিট কেনা মাত্র ট্রেন এসে পড়ল। তোরঙ্গটা আমার হাত থেকে নিয়ে বৃদ্ধিচাঁদ উঠে পড়লেন, আর আমাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, তোর বকশিশ। তখনই ট্রেন ছাড়ল।

আমি তাড়াতাড়ি কাকার বাসায় ফিরে এলাম এবং নোটের বান্ডিল সুদ্ধ ব্যাগটা বালিশের মতন মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম মোটেই হল না। বৃদ্ধিচাঁদের হাসিটা ছিল ছোঁয়াচে, সমস্ত রাত জেগে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগলাম। আমার একটা তোবড়া টিনের তোরঙ্গ ছিল, তাতেই সর্বস্ব থাকত। সকালে সেই তোরঙ্গে নোটের বান্ডিল রেখে বৈজনাথবাবুর বাড়ি গিয়ে তাঁকে আপিসের চাবি দিলাম। বৃদ্ধিচাঁদ বহরমপুর গেছেন শুনে তিনি বললেন, বহুত তাজ্জব কি বাত! তখনই তিনি প্রয়াগদাসের কাছে গেলেন।

বেলা দশটা নাগাদ হই হই কান্ড। সমস্ত শহরে রটে গেল —বৃদ্ধিচাঁদ বিস্তর টাকা নিয়ে পালিয়েছেন, ফার্মের আপিস পুলিসে ঘেরাও করেছে, প্রয়াগদাসের দু জন উকিলও সেখানে গেছেন। আমি কাকাকে বললাম, আমার মনিব তো ফেরার,

এখানে থেকে কি করব, কলকাতায় গিয়ে কাজের চেষ্টা করি গে। কাকার তখন বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, কিছুই বললেন না। আমি আমার টিনের তোরঙ্গ নিয়ে কলকাতায় চলে গেলাম। শুনেছিলাম দু দিন পরে পুলিস আমাকে সাক্ষী তলব করেছিল, কিন্তু আমি তখন নাগালের বাইরে।

এর পরের কথা খুব সংক্ষেপে বলছি। কলকাতায় পৌঁছেই নামটা বদলে ধনঞ্জয় করলাম। যে হোটেলে উঠেছিলাম, দু দিন পরে সেখানেই বাজার সরকারের চাকরি জুটে গেল। তার জন্যে অবশ্য পঞ্চাশ টাকা জমানত দিতে হয়েছিল।

ভোলা বলল, ধনু মামা, আসল কথাই তো আপনি বললেন না। কত টাকা সরিয়েছিলেন?

—এখন পর্যন্ত ঠিক করে গুনতে পারি নি,, খাজাঞ্চীর কাজ তো আমার রপ্ত নেই। এক বার গুনে হল দেড় লাখের কাছাকাছি, আর একবার হল চোদ্দ হাজার কম, আর একবার ত্রিশ হাজার বেশী। ভাবলাম, দুত্তোর, ঠিক করে জেনে কি হবে, টাকা তো ব্যাংকে দিচ্ছি না, আমার কাছেই থাকবে। তার পর রোজগারের চেষ্টায় লেগে গেলাম, সে সব বৈষয়িক কথা তোদের ভাল লাগবে না। একটা বিয়েও করেছিলাম, কিন্তু বউটা টিকল না। আমার এই রুপো বাঁধানো কলি হুঁকোটি সেই বিয়েতেই দান পেয়েছিলাম। পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক রকম ব্যবসা করেছি, তেজারতিও করেছি। রোজগার মন্দ হয় নি। আমার বাবুগিরি

আর বদখেয়াল ছিল না, তাই পুঁজির টাকা খরচ হয় নি, বরং একটু বেড়েই গেছে। শেষ বয়সে আর রোজগারের ইচ্ছে রইল না, শক্তিও গেছে, তাই কলকাতা ছেড়ে এই নিরিবিলিতে বাস করতে এসেছি। এইবার গীতাখানা একবার পড়ে ফেলতে হবে।

ভোলা বলল, বৃন্ধিচাঁদের কি হল ?

—তাঁর নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল, শুনেছি তিনি সাধু সেজে হরিদ্বারে ছিলেন, পুলিস সেখানেই তাঁকে ধরে। অনেক দিন মামলা চলল, বৃন্ধিচাঁদ তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন—চুরি তো করেছে সেই শয়তান হাব্বু শালা, আমি শুধু বদনামের ভয়ে ভেগেছিলাম। তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। বৃন্ধিচাঁদের নিশ্চয় জেল হত, কিন্তু তাঁর ভাবীজী তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে প্রয়াগদাস মকদ্দমা মিটিয়ে ফেললেন। শুনেছি বৃন্ধিচাঁদ আসামে গিয়ে কাঠের কারবার ফেঁদেছিলেন।

ভোলা বলল, আচ্ছা ধনু মামা, আপনার অত টাকা কাকে দিয়ে যাবেন ?

—তোর মাকে অনেক টাকা দেব, আমার খুব সেবা করছে কিনা। বাকী আমার সঙ্গেই যাবে।

—সেকি! মরে গেলে কেউ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নাকি ?

—আমি ঠিক পারব, তোরা দেখে নিস।

ধনু মামার কথা শেষ হল। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম।

সাত দিন পরে একজন লোক আমাদের ইস্কুলে খবর দিল, ধনু মামা হঠাৎ মারা গেছেন, ভোলাকে তার মা এখনই বাড়ি যেতে বলেছেন। ছুটি নিয়ে আমিও ভোলার সঙ্গে গেলাম।

ধনু মামাকে উঠনে শোয়ানো হয়েছে। তাঁর মুখ একটু ফাঁক হয়ে আছে, যেন হাসতে হাসতেই মারা গেছেন। পাড়ার জন কতক মেয়ে পুরুষ ভোলার মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন। তিনি চিৎকার করে হাত নেড়ে বলছেন, পাজী হতভাগা নিমকহারাম বুড়ো, এত দিন সেবা যত্ন করলাম আর দিয়ে গেলেন মোটে দু শ! সর্বনেশে কুচুন্ডে জোচ্চোর ছ্যাঁচড়! আমাকে না হয় ফাঁকি দিলি, দান ধ্যানের জন্যেও তো রেখে যেতে পারতিস!

ভোলা খোঁজ নিয়ে আমাকে যা জানাল তা এই।—ধনু মামার তোরঙ্গ থেকে দুটো বাণ্ডিল আর একটা লেখা কাগজ বেরিয়েছে। ছোট বান্ডিলটার উপর লেখা আছে—ভোলার জননী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দরানীকে আমার উপার্জিত এই দুই শত টাকা নগদ দান করিলাম; ইহাই যথেষ্ট, স্ত্রীলোকের অধিক লোভ ভাল নহে। বড় বাণ্ডিলের উপর লেখা আছে—খুলিবে না, ইহা আমার দৈবলব্ধ নিজস্ব ধন, যেমন আছে তেমনি আমার চিতায় দিবে। কাগজটায় লেখা আছে—আমার যে রুপো বাঁধানো ঢাকাই কলি হুঁকা আছে তাহা শ্রীমান ভোলানাথ পাইবে; এবং আমার আঙুলে যে রুপার গণেশ-মার্কা আংটি আছে তাহা ভোলানাথের বন্ধু শ্রীমান রামেশ্বর পাইবে।

ভোলার মা কিন্তু ধনু মামার অন্তিম ইচ্ছা পালন করেন নি,

বড় বান্ডিলটাও খুলে দেখেছেন। তাতে বিস্তর নোট আছে বটে, কিন্তু তার দাম এক পয়সাও নয়, সমস্ত কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটা। তাঁর দৈবলব্ধ ধনের অপব্যবহার যাতে না হয় ধন্দু মামা তার পাকা ব্যবস্থা করে গেছেন। ভোলার মা সেই নোটের কুচি ঝেঁটিয়ে ফেলে দিলেন। হুঁকোটি ভোলার ভোগে লাগে নি, তার মা আছড়ে ভেঙে ফেলে রুপোর পাত খুলে নিলেন। কিন্তু আমাকে বঞ্চিত করেন নি, গণেশ-মার্কা রুপোর আংটিটা আমাকে দিয়েছিলেন। ধন্দু মামার সেই স্মৃতিচিহ্ন আমি সযত্নে রেখেছি।

১৩৬২

মাঙ্গলিক

সভাপতি বললেন, ওঃ আমাদের কি অচিন্তনীয় সৌভাগ্য! যে মহাপুরুষ আজ এই মহতী সভায় পদার্পণ করেছেন চত সংবর্ধনা করি এমন সামর্থ্য রে নেই। এ'র মুখের ভাষা আমা অবোধ্য। আমাদের বাগ্‌যন্ত্র এ'র নাম উচ্চারণ করতে পারে না, দের লেখনীও তা ব্যক্ত করতে পারে না। তবে এই মহান অতিথির কি পরিচয় দেব? শুধু বলতে পারি, ইনি মাঙ্গলিক। এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অমানুষী প্রতিভার বলে ইতি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছেন এবং তাতেই নিজের বাণী দেবেন। এ'র সময় অতি অল্প, আধ ঘণ্টা পরেই স্বলোকে প্রত্যাবর্তন করবেন। আপনারা প্রশ্ন করে বাধা দেবেন না, এ'র শ্রীমুখ থেকে যে সুসমাচার নিঃসৃত হবে তাই ভক্তিভরে শ্রবণ মনন ও হৃদয়ে ধারণ করুন।

সামনের মাইক্রোফোনটা ঠেলে ফেলে দিয়ে সর্বজনীন পুজোর লাউড স্পীকারের মতন কান ফাটা নিনাদে মাঙ্গলিক বলতে লাগলেন।—

ওহে সভাপতি আর উপস্থিত মানুষরা—গোড়াতেই জানিয়ে রাখছি, বাজে কথা আমি বলি না। তোমাদের এই

সভাপতি মাননীয় কিনা, মহাশয় কিনা, তার প্রমাণ নেই, সেজন্য ও সব না বলে শুধু সভাপতি বলেছি। যারা আমার বাণী শুনতে এখানে এসেছে তাদের ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ বলতেও আমি রাজী নই। তোমাদের মধ্যে কত জন ভদ্র আর কত জন অভদ্র আছে তা আমি জানব কি করে? কোনও প্রাণিজাতির উল্লেখ করতে হলে কেউ ভেড়া-ভেড়ী বা ছাগল-ছাগলী বলে না, শুধু ভেড়া বা ছাগল বললে তৎ তৎ প্রাণীর স্ত্রীপুরুষ দুইই বোঝায়। অতএব ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলা না বলে আমি তোমাদের যে শুধু মানুষ বলে সম্বোধন করেছি তাই যথেষ্ট। যাক, এখন আমার বক্তব্য শোন। তোমাদের অসংখ্য জিজ্ঞাস্য আছে, নানা বিষয় জানবার জন্যে ছটফট করছ, তা আমি বুঝি। কিন্তু আমার সময় অতি অল্প আর তোমাদের বোধশক্তিও অতি ক্ষীণ, সেজন্যে অতি সংক্ষেপে ভাষণ দিচ্ছি।

তোমাদের কৌতূহল কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্তির জন্যে জানাচ্ছি —আমরা বিশ জন মঙ্গল গ্রহ থেকে এই ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেছি। পরে অন্যান্য দেশেও আমরা যাব। আমাদের উদ্দেশ্য—মানবজাতির কিঞ্চিৎ মঙ্গল সাধন। কি করে এসেছি জানতে চাও? উড়ন চাকতিতে চড়ে আসি নি, থালা বা রেকাবিতে চড়েও আসি নি। অতি সোজা উপায়ে ঝুপ করে নেমেছি, উল্কাপাত যেমন করে হয়। পতনের দারুণ বেগ কি করে সয়েছি, তোমাদের স্থূল বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যাই নি কেন—এ সব জানতে চেয়ো না, জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তোমরা

বুঝতে পারবে না। আমাকে যেমন দেখছ আমার আসল মূর্তি তেমন নয়, উপস্থিত প্রয়োজনে এই পৃথিবীর উপযুক্ত দেহ ও বেশ ধারণ করেছি। আর একটা কথা তোমাদের হৃদয়ংগম করা দরকার। তোমাদের অর্থাৎ মানবজাতির এখন শৈশবদশা চলছে, কিন্তু মঙ্গলগ্রহবাসী আমরা অত্যন্ত প্রবীণ ও পরিপক্ক। আমাদের তুলনায় তোমরা নিরতিশয় অপোগণ্ড, বিদ্যাবুদ্ধিতে দশ কোটি বৎসর পিছিয়ে আছ। অতএব আমি যে সদুপদেশ দিচ্ছি তা নিয়ে তর্ক ক'রো না, নির্বিচারে মেনে নাও, তাতেই তোমাদের মঙ্গল হবে।

আগে তোমাদের বহিরঙ্গ অর্থাৎ দেহ বেশ চাল-চলন ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলছি, তার পর অন্তরঙ্গ অর্থাৎ পলিটিক্‌সের আলোচনা করব। মানুষ জাতির দেহের গড়ন মন্দ নয়, তবে কদাচারের ফলে তোমরা তা কুৎসিত করে ফেলেছ। কেউ দেদার লুচি মণ্ডা মাছ মাংস ঘি দুধ খেয়ে মোটা থপথপে হয়েছ, কেউ হরদম চা সিগারেট পান দোক্তা প্রভৃতি বিষ খেয়ে চেহারাটি পাকাটে করে ফেলেছ। বোকামি আর অত্যাচারের ফলে কেউ কেউ ব্যাধি-গ্রস্ত হয়েছ। তোমাদের পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত অভাব দেখছি। জীবাণুতত্ত্ব তোমরা একটু আধটু জান, তবু গতানুগতিক ফ্যাশনের বশে নিজের শরীর আর গৃহকে ব্যাকটিরিয়ার ভাণ্ডার বানিয়েছ। এখানে অনেকের গোঁফ দেখছি, কয়েক জনের দাড়িও দেখছি। দশ-বারো জন টেকো মানুষ ছাড়া আর সকলের মাথায় চুলও দেখছি। আর মেয়েদের মাথায় তো চুলের জঙ্গল। ছি ছি ছি।

এও কি জান না যে গোঁফ দাড়ি আর চুল হচ্ছে জীবাণুর আড়ত? তোমাদের স্বাস্থ্যবিশারদগণ অতি অকর্মণ্য, তাই এই কদর্য প্রথা তুলে দেবার কোনও চেষ্টা করেন নি। কামিয়ে ফেল, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই নেড়া হও আর গোঁফ দাড়ি উৎপাটন করে ফেল। আমার শিরস্ত্রাণ দেখছ তো, পাতলা টাইটেনিয়ম ধাতুর তৈরী। এতে চুলের কাজ হয় অথচ ময়লা জমে না। এরকম জিনিস যদি এদেশে দুর্লভ হয় তবে অ্যালুমিনিয়মের টুপি পর। মেয়েরা যদি তাদের সেকেলে ফ্যাশন বজায় রাখতে চায় তবে টুপির পিছনে খোঁপার মতন একটা ঘটি জুড়ে দিতে পারে। ইচ্ছা হলে তাতে বেল ফুলের মালা জড়ানো চলবে। কিন্তু স্ত্রী আর পুরুষের আলাদা সাজের দরকারই হবে না, সে কথা পরে বলছি। তোমাদের বাড়িতে যেসব কম্বল রগ কার্পেট শতরঞ্জি আর পরদা আছে, নির্মম হয়ে পুড়িয়ে ফেল। যাতে ধুলো আর ব্যাকটিরিয়া জমতে পারে এমন জিনিস রেখো না।

তোমরা অনেকে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছ তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গুমট গরমে কোন আক্কেলে জামা কাপড় পরে আছ? শিশু আর পশুর মতন সরল হও, সব টান মেরে খুলে ফেলে দাও, সর্বাঙ্গে হাওয়া লাগুক। এই গরম দেশে বৎসরে ন মাস ধুতি পঞ্জাবি প্যাণ্ট শার্ট শাড়ি ব্লাউজ একবারেই অনাবশ্যক, স্বচ্ছন্দে দিগম্বর হয়ে থাকতে পার। শুধু মাথায় একটা পাতলা ধাতুর টুপি আর পায়ে এক জোড়া জুতো, এ ছাড়া কিছুই পরবে না। তবে হাঁ, কাঁধ থেকে ফিতে দিয়ে একটা ঝুলি ঝোলাতে পার,

তাতে টাকাকড়ি নোটবুক পেনসিল কলম রুমাল ইত্যাদি থাকবে। আরশি পাউডার, মুখে আর গায়ে লাগাবার রং‌ও তাতে রাখতে পার। অবশ্য শীতের সময় সবাই উপযুক্ত জামা কাপড় পরবে, রবার বা প্লাসটিকের। ইওরোপ আমেরিকার মেয়েদের তবু একটু বুদ্ধি আছে, তারা ক্রমশ দিগম্বরী হচ্ছে। কিন্তু ওখানকার পুরুষরা বড় বোকা আর লাজুক, অনর্থক কাপড়ের বোঝা বয়ে বেড়ায়। তোমরা ভাবছ আমি নিজের শরীর আগা-গোড়া ঢেকে রেখেছি কেন। ভুল বুঝেছ, আমার অঙ্গে যা দেখছ তা বস্ত্র নয়, এই পৃথিবীর ভীষণ অভিকর্ষের চাপে পাছে আমার হালকা শরীরটি চেপটে যায় এবং এখানকার অত্যধিক অক্সিজেন পাছে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাই বর্ম ধারণ করেছি। এই বর্মের অভ্যন্তরে আমি সদ্যোজাত শিশুর মতন নেংটা।

তোমাদের এই পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থা বড় মন্দ দেখছি। ভোট আর জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার পেলেও স্ত্রীজাতির সুবিধা হবে না। গহনা আর শৌখিন বস্ত্রে ওদের ভুলিয়ে রাখলেও ন্যায়বিচার হবে না। ওদের দুর্দশার কারণ প্রাকৃতিক। মানুষ জাতির স্ত্রীরা গর্ভধারণ করে কিন্তু পুরুষরা করে না। প্রকৃতির এই পক্ষপাতের ফলে স্ত্রীজাতি পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর হতে পারে না, পুরুষ কিংবা রাষ্ট্রের অনুগ্রহ না পেলে তাদের চলে না। কুমারী থাকলে অথবা গর্ভ-রোধ করলে অবস্থার উন্নতি হবে না। প্রাণী মাত্রেই সন্তান চায়, এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা দমন করা অন্যায়। একমাত্র উপায়—

স্ত্রী আর পুরুষের ভেদ লোপ করা, অর্থাৎ স্ত্রী যেমন মাঝে মাঝে গর্ভবতী হয় পুরুষও তেমনি মাঝে মাঝে গর্ভবান হবে। স্ত্রী আর পুরুষ দুরকম মানুষ থাকাই অন্যায়। যেমন শামুক প্রভৃতি কয়েক প্রকার প্রাণী তেমনি আমরা মাঙ্গলিকরা উভয়লিঙ্গ হার্মাফ্রোডাইট, প্রত্যেকেই অর্ধনারী অর্ধপুরুষ। আমাদের স্বামী-স্ত্রী ভেদ নেই। কিন্তু দম্পতি আছে, সন্তানের প্রয়োজন হলে দম্পতির দুজনেই পালা করে গর্ভধারণ করে। মানুষেরও সেই ব্যবস্থা দরকার। তোমাদের কেন্দ্রীয় সংসদে পুংস্ত্রীসমীকরণের জন্যে একটা আইন পাস করিয়ে নাও, তার পর যা করবার আমরা করব। মাঙ্গলিক শরীরবিজ্ঞানীরা অনায়াসে তোমাদের দেহের অদলবদল করে দিতে পারবেন, এবং এক বার করে দিলে বংশানুক্রমে তা বজায় থাকবে।

এখন পলিটিক্স সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলছি। এই পৃথিবীতে রাষ্ট্রচালনার দু রকম রীতি আছে দেখছি। একটি হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র, অর্থাৎ এক জন বা এক দল ধূর্ত লোক সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে রাখে, তাদের শাসন আর সবাই ভেড়ার পালের মতন মেনে নেয়। অন্য রীতি হচ্ছে লোকতন্ত্র, অর্থাৎ জনসাধারণ যাদের নির্বাচন করে তারাই রাষ্ট্র চালায়। কিন্তু নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বিস্তর অকর্মণ্য আর দুশ্চরিত্র লোক থাকে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি সাধু বুদ্ধিমান হত তবে লোকতন্ত্রে মোটামুটি কাজ চলত। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এখনও অত্যন্ত কাঁচা আর চরিত্রেও বিস্তর গলদ আছে। এমন অবস্থায়

স্বৈরতন্ত্র আর লোকতন্ত্র দুটোই তোমাদের পক্ষে অনিষ্টকর। তোমরা মনে কর, স্বাধীনতা পেয়েছ। ছাই পেয়েছ। আসল স্বাধীনতা লাভের উপায় বলছি শোন।

তোমাদের মধ্যে ক জন এয়ারোপ্লেন জাহাজ রেলগাড়ি বা গরুর গাড়ি চালাতে পার? রাষ্ট্রচালনা কি তার চাইতে সহজ মনে কর? সবাই মিলে দেশ শাসন করবে এ দুর্বুদ্ধি ত্যাগ কর। আনাড়ী লোকের তা সাধ্য নয়। হয়তো লক্ষ বৎসর পরে মানুষ জাতি লায়েক হবে, কিন্তু তত দিন তোমাদের হিতকামী গুরু বা অভিভাবক দরকার। আমরা মাঙ্গলিকরা সেই গুরু দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছি। তোমাদের নানা রাজনীতিক দল আছে, ও সবে যোগ দিও না। নতুন দল তৈরি কর—ইন্ডো-মার্স বা ভারত-মঙ্গল পার্টি। আগামী ইলেকশনে তোমরা প্রতিনিধি খাড়া করবে, আমরা সর্বতোভাবে তোমাদের সাহায্য করব। সমস্ত আসনই তোমরা দখল করতে পারবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তার পর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সভায় একমাত্র দল হয়ে ঢুকে পড়, আমাদের হাতে শাসনের ভার ছেড়ে দাও। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবে, খাবে দাবে ফুর্তি করবে কবিতা আর গল্প লিখবে, গান শুনবে, হরেক রকম নাচ দেখবে, আর রাষ্ট্রচালনার সমস্ত ঝক্কি আমরা নেব। শুধু ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই এই ব্যবস্থা চালাতে হবে। মানুষ আর মাঙ্গলিকের এই নিবিড় সম্পর্ক ঘটলেই তোমরা বুঝতে পারবে—আমাদের যা মতামত তোমাদেরও তাই, আমরা যা ভাল মনে করি তাই তোমাদের পক্ষে ভাল।

আসল স্বাধীনতা আর ডিমোক্রাসি একেই বলে। অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমার ভয় খাচ্ছ? ও সব ছেলে-ভুলনো জুজু আমরা গ্রাহ্য করি না, সমস্ত ফুঁয়ে উড়িয়ে দেব, বদমাশ গুণ্ডাদের ঝাড়ে বংশে সাবাড় করব।

আজ এই পর্যন্ত। আর একদিন এসে সব কথা তোমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেব। সভাভঙ্গের আগে সবাই সমস্বরে আওয়াজ তোল—স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, লোকতন্ত্র জাহান্নমে যাক, ইয়ে আজাদী ঝুটা হৈ, হমারা দাদা মাঙ্গলিক, ভারত-মঙ্গল

১৩৬২

নিধিরামের নির্বন্ধ

নিধিরাম সরকার ভেবে ভেবেই মারা গেলেন। তাঁর শারীরিক ব্যাধি বা আর্থিক অভাব ছিল না, সাংসারিক শোক তাপও তিনি পান নি, তবু দুর্ভাবনায় তাঁর জীবনান্ত হল।

নিধিরাম সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী লোক, কিন্তু অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। তাঁর মনে নিরন্তর সংশয় উঠত—সুরেন বাঁড়ুজ্যে না বিপিন পাল, বেঙ্গলী না ইংলিশম্যান—কার উপদেশ ভাল? গান্ধীজী না দেশবন্ধু, নেতাজী না পণ্ডিতজী—কার মতে চলা উচিত? কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিস্ট আর সমাজতন্ত্রী দল কোনওটাই তাঁর পছন্দ হয় নি। দেশের হিতার্থে তিনি বক্তৃতা দেন নি, ছেলে খেপান নি, ডাকাতি করেন নি, সুতো কাটেন নি, জেলে যান নি, শুধু মনে মনে মঙ্গলের পথ খুঁজেছেন। অবশেষে নৈরাশ্য আর চিন্তাবিষে জর্জর হয়ে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর এক শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু বললেন, মরবেই তো, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। আর এক ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু বললেন, কেয়ার কিল্‌ড এ ক্যাট।

নিধিরাম পরলোকে এলে বিধাতা তাঁকে বললেন, বৎস, তুমি সন্দেহাকুল কর্মবিমুখ হলেও তোমার চরিত্রটি প্রায় নিষ্পাপ ছিল, তাই এই আনন্দলোকে এসেছ। কি আনন্দ ভোগ করতে চাও তা বল।

নিধিরাম উত্তর দিলেন, ভগবান, আনন্দ চাই না। পৃথিবী অধঃপাতে যাচ্ছে, যাতে রক্ষা পায় তাই করুন।

বিধাতা বললেন, তুমি দেখছি মরে গিয়েও ভববন্ধনে জড়িয়ে আছ। ওহে নিধিরাম, পৃথিবী নেই, তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে। শুধু আমি আছি, এবং আমিই তুমি।

—প্রভু, সলিপ্‌সিজ্‌ম আর অদ্বৈতবাদ আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি মরে গেলেও জগৎ থাকবে না কেন ? সমস্ত পৃথিবীর ভাল যদি নাও করেন তবে অন্তত ভারতের যাতে ভাল হয় তাই করুন।

—ভালই তো চিরকাল করে আসছি।

—তার লক্ষণ তো কিছুই দেখছি না, যা করে থাকেন তা শুধু লীলাখেলা।

— ও, আমার লীলাখেলা তোমার পছন্দ নয়, তোমার ফরমাশী খেলা চাও ? 'নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।'— এই তোমার আবদার ? বেশ, তোমার দেশের কিরকম ভাল চাও তাই বল।

— মানুষ ভাল না হলে দেশের ভাল হবে না। আপনি দেশের অন্তত সিকি লোককে ভাল করে দিন, তারাই বাকী সবাইকে শোধরাতে পারবে।

— আচ্ছা, চৈতন্য মহাপ্রভু আর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভাল লোক মনে কর তো ?

কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে নিধিরাম বললেন, ও'রা অবতার কি

না জানি না, তবে মহাপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই।

—ভারতের সিকি লোক মানে ন কোটি। যদি ন কোটি ভারতবাসী শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণের তুল্য হয়ে যায় তা হলে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে তো?

মাথা চুলকে নিধিরাম বললেন, ভগবান, ও'রা যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেশের চার আনা লোক যদি বিরাগী ভক্ত হয়ে যায় আর বাকী বারো আনা তাদের অনুসরণ করে তবে সংসার যে ছারখারে যাবে। আমাদের দরকার কর্মী বুদ্ধিমান জনহিতৈষী সংসারী সৎপুরুষ। ত্যাগী ভক্ত সন্ন্যাসী গুটিকতক হলেই চলবে।

—উত্তম কথা। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, তুমি যে সব গুণ চাচ্ছ তাও তাঁর প্রচুর ছিল। যদি ভারতের ন কোটি লোক রবীন্দ্রনাথের তুল্য হয়ে যায় তা হলে খুশী হবে তো?

নিধিরাম আবার নমস্কার করে বললেন, প্রভু, পাঁচ শ বৎসরে যদি একটি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় তাতেই দেশ ধন্য হবে। কিন্তু যদি বিস্তর আসেন তবে আদি রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য যে খর্ব হবে, তাঁকে হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

—আচ্ছা, যদি ন কোটি মহাত্মা গান্ধীর মতন কর্মী জন-হিতৈষীর আগমন হয়?

—একই আপত্তি প্রভু। মহাত্মা গান্ধীকেও সস্তা করতে চাই না। আমাদের দেশ অসাধু অকর্মণ্য চোর ঘুষখোর বজ্জাত লোকে ভরে গেছে, তাদের পরিবর্তে দরকার সচ্চরিত্র সাধারণ

কাজের মানুষ। লোকোত্তর পুরুষ খুব কম হলেই চলবে।

—বুঝেছি, লোকোত্তর পুরুষের ইনফ্লেশন চাও না। আচ্ছা, যদি দেশের সিকি লোক জওহরলালের মতন হয়ে যায় তা হলে চলবে তো?

একটু ভেবে নির্ধিরাম বললেন, নেহরুজী জ্ঞানী কর্মী দূরদর্শী জনহিতৈষী সৎপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সমস্ত মন্ত্রী আর সরকারী আপিসের কর্তারা যদি তাঁর মতন হয়ে যায় তা হলে দেশের অশেষ মঙ্গল হবে। কিন্তু সে রকম ন কোটি লোকের উপযুক্ত কাজই দেশে নেই, তাঁদের দিয়ে তো মোটা কাজ করানো চলবে না।

—আচ্ছা যদি ন কোটি উদ্‌যোগী কর্মবীর ধনপতির আবির্ভাব হয় তা হলে তোমার আশা মিটবে?

—আপনি পরিহাস করছেন প্রভু। ন কোটি ব্যবসাদার কর্মবীরের স্থান কোথায়? কার ধন নিয়ে তাঁরা ধনপতি হবেন? অরণ্যের চার আনা পশু যদি বাঘ হয় আর বাকী বারো আনা যদি হরিণ হয় তবে আগে হরিণরা লোপ পাবে তার পর বাঘরা না খেয়ে মরবে। আমার নিবেদনটি শুনুন। ন কোটি মুক্তাত্মা সন্ন্যাসী, বা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বা রাজনীতিজ্ঞ সুশাসক হলে চলবে না। আর, ন কোটি ব্যবসায়ী ধনকুবের তো উপদ্রব স্বরূপ। নানারকম সাধারণ সচ্চরিত্র কর্মীরই দরকার—চাষী কারিগর শিল্পী বাস্তুকার যন্ত্রী বিজ্ঞানী শিক্ষক বিচারক পরিচালক কেরানী ইত্যাদি। তা ছাড়া অল্প গুটিকতক কলাবিৎ অর্থাৎ

লিখিয়ে আঁকিয়ে গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়েও চাই। লোকোত্তর পুরুষ কোটিতে এক-আধটি হলেই ঢের।

—তুমি যে রকম চাচ্ছ সে রকম কাজের লোক তো দেশে আছেই।

—কিন্তু তাদের মধ্যে যে বিস্তর মূর্খ আর দুর্বৃত্ত লোক আছে, তারাই দেশের মঙ্গল হতে দিচ্ছে না।

—ওহে নিধিরাম, ব্যস্ত হয়ো না। তোমার দেশে যত মূর্খ আর দুর্বৃত্ত আছে তারা খেয়োখেয়ি মারামারি করে আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পর কালক্রমে সুবুদ্ধি সৎপুরুষের আবির্ভাব হবে।

—তবেই হয়েছে। আপনি অনন্তকাল এক্সপেরিমেণ্ট করতে পারেন, কিন্তু দেশের লোকের অত ধৈর্য নেই, তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাল মন্দ উপায় খুঁজছে। আপনি ইচ্ছা করলেই তাদের সুপথে চালাতে পারেন।

—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। সৃষ্টি স্থিতি লয় ঘড়ির কাঁটার মতন যথানিয়মে হচ্ছে, জাগতিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করি না।

—ভগবান, বেশী কিছু তো চাচ্ছি না, লোকে যাতে অসংযমী উচ্ছৃঙ্খল আর সমাজদ্রোহী না হয় সেই ব্যবস্থা করুন।

—দেখ নিধিরাম, সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তোমার দেশে চাতুর্বর্ণ্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার পরিণাম কি হয়েছে দেখছ তো? তুমি যে রকম চাচ্ছ তা পাবে ইতর প্রাণীর

মধ্যে, তারা কখনও স্বজাতির ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু মানুষ চিরকালই নিজের মতলবে চলে।

—প্রভু, যদি একজন জবরদস্ত অবতার পাঠিয়ে দেন তবে তিনি তো অবলীলাক্রমে সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃতদের বিনাশ আর ধর্মসংস্থাপন করতে পারবেন।

—তুমি কি মনে কর সিভিলিয়ানদের মতন একদল অবতার আমি পুষে রেখেছি আর তোমাদের দরকার হলেই পাঠাব? মানুষ মাত্রেই অবতার, কেউ কম, কেউ বেশী। জনসমাজের অল্পাধিক মঙ্গল যে করতে পারে সেই অবতার। তোমারও সেই শক্তি আছে। যদি ইচ্ছা কর তুমি আবার জন্মগ্রহণ করে তোমার জাতভাইদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে পার।

—আমার কতটুকু ক্ষমতা প্রভু? আমার কথা শুনবেই বা কে?

—বুড়োরা না শুনুক, তারা আর কদিনই বা বাঁচবে। ছেলেরা শুনতে পারে, তারা এখনও ঝানু হয়ে যায় নি।

—হা ভগবান, আপনি দেখছি কোনও খবরই রাখেন না!

—শোনো নিধিরাম। ছেলেরা বুড়োদের কথা না শুনুক, সমবয়সীদের কথা শুনতে পারে। তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাও, জাতিস্মর না হলেও তোমার সদিচ্ছার সংস্কার থাকবে। বালক কিশোর আর যুবকদের তুমি সুমন্ত্রণা দিও।

—আমি একটি মন্ত্রণাই জানি,—আগে বিনয় ও শিক্ষা, তার পর কর্মপথ।

—বেশ তো, ওই মন্ত্রণাই দিও।

—আমার কথায় কেউ যদি কান না দেয়?

—তোমার চাইতে যাঁরা ঢের বড় অবতার তাঁদের কথাও সকলে শোনে নি। তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রো, তাতেই তোমার জন্ম সার্থক হবে। এক বারে কিছু করতে না পারলে বার বার অবতরণ ক'রো। যদি অনন্ত কালেও কিছু করতে না পার তা হলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষতি হবে না।

১৩৬২

স্মৃতিকথা

নয়নচাঁদ পাইনের ঘড়ির দোকান আছে, নানারকম শখও আছে। তিনি শাস্ত্র পড়েন, পাখোয়াজ বাজান, মাছ ধরেন, সাহিত্যের খবরও রাখেন। প্রবীণ লোক, পাড়ার সকলেই খাতির করে। সকালবেলা আমার কাছে এসে বললেন, এই নাও তোমার ঘড়ি। হেয়ারস্প্রিং বদলে দিয়েছি, পনরো টাকা দিও, তুমি পাড়ার ছেলে, অয়েলিংএর চার্জ আর তোমার কাছে নেব না।

টাকা নিয়ে নয়নচাঁদ বললেন, ও কি লেখা হচ্ছে ?

উত্তর দিলুম, একটা স্মৃতিকথা লিখছি।

—বেশ বেশ, গল্পের চাইতে ঢের ভাল। কিন্তু বেশী মিছে কথা লিখো না, যা রয় সয় তাই লিখবে। কলেরা থেকে উঠেই ফুটবল ম্যাচ খেলেছ, দেশের জন্যে দশ বছর জেল খেটেছ, তিনটে মেয়ে তোমাকে প্রেমপত্র লিখেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে তোমার পিঠ চাপড়েছিলেন, এসব লিখতে যেয়ো না। আর একটি কাজ তোমাদের করা উচিত, কিছু লেখবার আগে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেবে, ডাক্তার উকিল প্রোফেসার ব্যবসাদার এইসব লোকের। তা হলে আর মারাত্মক ভুল করে বসবে না।

পাইন মশায়ের উপদেশ মনে লাগল। যা লেখবার আগেই

স্থির করে ফেলেছি, তবে বিশেষজ্ঞদের মত এখনও নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমেই গেলুম ডাক্তার নির্মল মুখুজ্যের কাছে। তিনি বললেন, কি খবর, কোমরের বেদনাটা আবার বেড়েছে নাকি?

— না না, ওসব কিছু নয়। আচ্ছা ডাক্তার, আমি যদি কোনও লোকের দুই কাঁধে হাত দিয়ে খুব চাপ দিই তা হলে তার শিরদাঁড়া ভাঙতে পারে?

— কতখানি চাপ?

— এই ধর দু-আড়াই মন।

— অর্থাৎ এক শ কিলোগ্রামেরও কম। তাতে লোকটা কাবু হতে পারে, স্ক্যাপিউলা ফ্র্যাকচার হতে পারে, কিন্তু তিন-চার মন চাপের কমে শিরদাঁড়া ভাঙবে মনে হয় না। ও কাজ করতে যেয়ো না, ফৌজদারিতে পড়বে।

ডাক্তারকে থ্যাংক্‌স দিয়ে উকিল নগেন সেনের কাছে গেলুম। তিনি বললেন, ওহে, আমার একটা বিল এখনও শোধ কর নি, টাকাটা কালকের মধ্যে পাঠিয়ে দিও।

—যে আজ্ঞে। একটা কথা জানতে এসেছি।—একটি মেয়ে যদি জুলুম ক'রে একজন পুরুষকে বিবাহে রাজী করায় এবং পুরুষটি পরে অস্বীকার করে, তা হলে ব্রীচ অভ প্রমিস মকদ্দমা চলতে পারে?

—যদি প্রমাণ হয় যে জবরদস্তির ফলে পুরুষটি রাজী হয়েছিল তা হলে কেস টিকবে না।

—আচ্ছা, যদি প্রমাণ হয় যে জবরদস্তির পরেও পুরুষটি খোশ-মেজাজে মেয়েটিকে প্রিয়ে বলেছিল?

—তাই বলেছিল নাকি হে? আচ্ছা বোকা তুমি। নাঃ, তা হলে আর নিস্তার নেই। তোমার এ কুবুদ্ধি হল কেন?

—আজ্ঞে আমি নই। আচ্ছা, চললুম, নমস্কার।

তার পর গেলুম দাশু মল্লিকের কাছে। লোকটি বিখ্যাত মাতাল, তবে মেজাজ ভাল। আমাকে দেখেই বললেন, আরে তোমাকেই খুঁজছিলুম, একটা দরকারী কথা জানতে চাই। তুমি তো কেমিস্ট্রি পড়েছিলে?

—সে বহুকাল আগে, এখন সব ভুলে গেছি।

—একটু তো মনে আছে, তাতেই কাজ চলবে। দেখ ভাই, বড়ই মুশকিলে পড়েছি, কাণ্ট্রি আমার সয় না, অথচ বিলিতী একবারে আগুন। শুনছি সবরকম মদই বন্ধ করা হবে, যত সব গো-মুখ্খু আইন তৈরি করছে। আচ্ছা, মিষ্টি জিনিস গেঁজে উঠলেই তো মদ হয়?

—তা হয়। কিন্তু বাড়িতে ওসব করতে যাবেন না, ফ্যাসাদে পড়বেন।

—আরে না না। আমি একটা মতলব ঠাউরেছি, আবকারির বাবার সাধ্য নেই যে ধরে। মনে কর আমি এক পো চিনি কিংবা গুড় খেলুম, সেই সঙ্গে একটু ঈস্ট বা পাঁউরুটিওয়ালাদের খামি খেলুম। তাতে পেটের মধ্যে বুঁদি কেটে স্পিরিট হবে না?

—আজ্ঞে না, আপনার পেটটি তো ভাঁটি নয়। গেঁজে ওঠবার

আগেই হজম হয়ে যাবে, না হয় প্রস্রাবের সঙ্গে বেরুবে।

—তবেই তো মুশকিল। যাক, তোমার কি দরকার বল।

—আচ্ছা মল্লিক মশায়, যদি মদ খাওয়ার অভ্যাস না থাকে তবে কতটা খেলে নেশা হবে?

—বেশ বেশ, ওদিকে তোমার মতি হয়েছে জেনে খুশী হলুম। ট্রাই করেই দেখ না, এক আউন্স রম বা জিন থেকে শুরু করতে পার।

—আজ্ঞে আমি নই, আমার স্মৃতিকথার একটি লোককে খাওয়াতে চাই।

—আরে দূর দূর। তা আউন্স চারেক খাওয়াতে পার, গল্পের নেশায় তো দাম লাগবে না।

দাশু মল্লিককে নমস্কার করে বিদায় নিলুম। এখনও অনেক এক্সপার্ট বাকী, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, প্রত্নবিশারদ, পুরাণজ্ঞ, আরও কত কি। অত অভিমত নেবার সময় নেই, একটু না হয় ভুলই হবে। এখন স্মৃতিকথা আরম্ভ করা যাক।—

বাজনন্দিনী পুষ্কলা বললেন, পিসীমা, এই দেখ দু শ খিলি পান সেজেছি। মুক্তোপোড়া চুন, কেরল দেশের কেয়া-খয়ের, ঘিএ ভাজা সুপুরি, আর তুমি যেসব মসলা ভালবাস—এলাচ লবঙ্গ দারচিনি জাফরান কর্পূর হিং রশুন বিটনুন ইত্যাদি তেত্রিশ রকম সব দিয়েছি। তোমার পানের বাটা ভরতি হয়ে গেছে। এইবারে স্মৃতিকথা বলতে হবে কিন্তু।

রাজভগিনী শূর্পণখা খুশী হয়ে বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে তুই। আশীর্বাদ করি রূপে গুণে নিখুঁত একটি বরের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়ে যাক, তা হলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।

— বর এখন থাকুক, তুমি স্মৃতিকথা বল।

— সে সব দুঃখের কাহিনী শুনে কি হবে? ওঃ, অযোধ্যার সেই বজ্জাতদের কথা মনে পড়লেই আমার মাথা বিগড়ে যায়, দাঁত কিড়মিড় করে, রক্ত টগবগিয়ে ফোটে, শোক উথলে ওঠে।

— তা হ'ক, তুমি বল।

বিকাল বেলা দোতলার বারান্দায় বাঘের চামড়ার উপর বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শূর্পনখা সমুদ্রবায়ু সেবন করছিলেন, পুষ্কলা পানের বাটা এনে তাঁর পাশে বসলেন।

রাবণবধের পর দু বৎসর কেটে গেছে। বিভীষণ রাজা হয়েই লঙ্কার প্রাসাদ মন্দির উপবন প্রভৃতি মেরামত করিয়েছেন। হনুমান যে ভীষণ ক্ষতি করেছিলেন তার চিহ্ন এখন বেশী দেখা যায় না। বিভীষণ তাঁর ছোটবোনকে একটি আলাদা মহল দিয়েছেন, শূর্পনখা তাঁর চেড়ীদের সঙ্গে সেখানে বাস করেন। বিভীষণ আর সরমার উপর মনে মনে প্রচন্ড আক্রোশ থাকলেও তাঁদের কিশোরী কন্যা পুষ্কলাকে তিনি স্নেহ করেন।

রাক্ষস ছলৎকারু খুব ভাল কারিগর, যুদ্ধের সময় ইন্দ্রজিতের আজ্ঞায় সে মায়াসীতা গড়েছিল। ইন্দ্রজিৎ তাঁর রথের উপরে সেই মূর্তি কেটে ফেলে হনুমানকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিলেন। শূর্পণখা এখন যে সুন্দরী কাঠের নাসাকর্ণ ধারণ করেন তাও ওই

ছলৎকারের রচনা। দেখতে প্রায় স্বাভাবিক, সহজে ধরা যায় না, কিন্তু শূর্পণখার কথার নাকী সুর দূর হয় নি।

পঁচিশ খিলি পান একসঙ্গে মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করে শূর্পণখা তাঁর স্মৃতিকথা বলতে লাগলেন।—জানিস কলা, লঙ্কার এই রাজবংশ যেমন মহান তেমনি বিপুল। আমাদের মাতামহ ছিলেন প্রবলপ্রতাপ সুমালী, বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি লঙ্কা ত্যাগ করে রসাতলে আশ্রয় নেন। তখন যক্ষদের রাজা কুবের লঙ্কা অধিকার করল। সুমালীর কন্যা কৈকসী (যাঁর অন্য নাম নিকষা) মহামুনি বিশ্রবার ঔরসে তিন পুত্র আর এক কন্যা লাভ করেন। বড় ছেলে রাবণ, মেজো কুম্ভকর্ণ, ছোট তোর বাপ বিভীষণ, আর তাঁদের ছোট আমি। বিশ্রবার প্রথম পক্ষের এক ছেলে ছিল, সেই হল কুবের। রাবণ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠলেন, তখন বিশ্রবা মুনির উপদেশে কুবের লঙ্কা ছেড়ে হিমালয়ের ওপারে পালিয়ে গেল, লঙ্কা আবার আমাদের দখলে এল।

পুষ্কলা বললেন, ওসব ইতিহাস তো আমার জানা আছে, তুমি নিজের কথা বল। তোমার একবার বিয়ে হয়েছিল না ?

আরও পঁচিশ খিলি পান মুখে পুরে শূর্পণখা বললেন, বিয়ে তো একবার হয়েছিল। দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্ব আমার স্বামী ছিলেন, অতি সুপুরুষ আর আমার খুব বাধ্য। কিন্তু বড়দার তো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, কালকেয় দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় নিজের ভগিনীপতিকেই মেরে ফেললেন। আমি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে লঙ্কেশ্বরকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিলুম।

তিনি বললেন, চেঁচাস নি বোন, একটা স্বামী মরেছে তো হয়েছে কি? যুদ্ধের সময় আমি প্রমত্ত হয়ে শরক্ষেপণ করি, তোর স্বামীকে চিনতে না পেরে বধ করে ফেলেছি। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন শোক সংবরণ কর, তোর জন্যে আমি ভাল ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাদের মাসতুতো ভাই খর চোদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছে, তুইও তার সঙ্গে সেখানে যা। খর তোর সমস্ত আজ্ঞা পালন করবে। দণ্ডকারণ্য খাসা জায়গা, বিস্তর ঋষি সেখানে তপস্যা করেন, অনেক ক্ষত্রিয় রাজাও মৃগয়া করতে যান। সেখানে তুই অনায়াসে আর একটি স্বামী জুটিয়ে নিতে পারবি।

খর-দাদার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে গেলুম। সত্যিই ভাল জায়গা, বিশেষ করে জনস্থান অঞ্চল, যেখানে আমরা বসতি করলুম। কিন্তু বড়দার সব কথা সত্যি নয়, ক্ষত্রিয় সেখানে কেউ আসত না, ঋষিও খুব কম, রাক্ষসের ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে তপস্যা করত। তবে খাবার জিনিসের অভাব নেই, বিস্তর আম কাঁঠাল কলা নারকেল, মধুও প্রচুর, নানা জাতের হরিণও পাওয়া যায়।

পুষ্কলা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা পিসীমা, তুমি ঋষি খেয়েছ?

মুখে আবার পঁচিশ খিলি পান পুরে শূর্পণখা বললেন, আমাদের বাপ মহামুনি বিশ্রবা ঋষি-খাওয়া পছন্দ করতেন না। ছোটলোক রাক্ষসরা নরমাংস ভালবাসে, কিন্তু আমরা রাজবংশের মেয়েপুরুষ বড় একটা খেতুম না। তবে কোনও মানুষের উপর বেশী চটে গেলে তাকে ভক্ষণ করতুম আর পুজো-পার্বণে

নিকুম্ভিলা দেবীস্থানে নরবলি দিয়ে সেই পবিত্র মাংস খেতুম। আমি বার পাঁচেক ঋষি খেয়েছি, ছিবড়ে বড় বেশী, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজা আর রাজপুত্রদের মাংস ভাল, কচি পাঁঠার মতন। সে সব দিন আর নেই রে পুষ্কলা, তোর বাপের কি যে মতিচ্ছন্ন হল, সব বন্ধ করে দিয়েছে। তার পর শোন।—দণ্ডকারণ্যে বেশ ফুর্তিতেই ছিলুম, কিন্তু দিন কতক পরে বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল, মনটা উদাস হয় পড়ল। বড় ঘরানার দানব বা রাক্ষস সে অঞ্চলে কেউ নেই, অগত্যা ঋষির সন্ধান করতে লাগলুম। বেশীর ভাগই বুড়ো হাবড়া, মাথায় জটা, এক মুখ দাড়িগোঁফ, তাদের সঙ্গে প্রেম হতে পারে না।

দণ্ডকারণ্যে আমার একটি সঙ্গিনী জুটেছিল, জম্ভলা রাক্ষসী, গোদাবরীতীরে থাকত। সে আমাকে বলল, সখী, তুমি ভেবো না, আমি একটি সুন্দর তরুণ ঋষি যোগাড় করে দেব। জম্ভলা খুব চালাক আর কাজের মেয়ে, চারদিকে ঘুরে সন্ধান নিতে লাগল। তার পর একদিন বলল, চমৎকার একটি ছোকরা ঋষি পেয়েছি দিদিরানী, আমাকে মুক্তোর হার বকশিশ দিতে হবে কিন্তু। যে খবর দিল তাতে ম, মুদ্গল নামে একটি সুন্দর তরুণ ঋষি সম্প্রতি জনস্থানে এসেছেন, গোদাবরী নদীর ধারে কুটীর বানিয়ে তপস্যা করছেন। সেই দিনই বিকেলে তাঁকে দেখতে গেলুম।

পুষ্কলা প্রশ্ন করলেন, খুব সেজেগুজে গিয়েছিলে তো ?

আরও পঁচিশ খিলি পান মুখে পুরে শূর্পণখা বললেন, তা

আর তোকে বলতে হবে না। চোখে কাজল, কপালে তেলা-পোকার টিপ, গালের রং যেন দুধে-আলতা, ঠোঁট পাকা তেলাকুচো, খোঁপায় শিমুল ফুল, কানে ঝুমকো-জবা, গলায় সাতনরী মুক্তোর মালা, পরনে নীল শাড়ি, বুকে সোনালী কাঁচুলি, আর এক গা গহনা। দেখলে পুরুষের মুণ্ডু ঘুরে যায়। মুদ্গল ঋষির আশ্রমে যখন পৌঁছলুম তখন তিনি বেদপাঠ করছিলেন। তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলুম, আমার আগেকার স্বামীর চাইতে ঢের ভাল দেখতে। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে তিনি বললেন, ভদ্রে, তুমি কে? কি প্রয়োজনে এসেছ? আমি উত্তর দিলুম, তপোধন, আমি রাজকন্যা শুক্তিনখা—

পুষ্কল্য বললেন, ও নাম আবার কোথা থেকে পেলে?

—আসল নামটা ভদ্রলোকের কাছে বলতে ইচ্ছে হল না। বাবা বিশ্রবার যেমন বুদ্ধি, তাই একটা বিশ্রী নাম রেখেছেন। শুক্তিনখা—কিনা ঝিনুকের মতন ধার যার নখ। তার পর আমি বললুম, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমি কাছেই থাকি। তিন মাস ধরে বিভীতক ব্রত পালন করছি, অহোরাত্রে শুধু একটি বিভীতক ফল অর্থাৎ বয়ড়া আহার করি। কাল আমার ব্রতের পারণ হবে, সেজন্যে একটি ব্রাহ্মণভোজন করাতে চাই। আপনি কৃপা করে কাল মধ্যাহ্নে এই দাসীর কুটীরে পদধূলি দেবেন।

—আচ্ছা পিসীমা, সেই কচি ঋষিটিকে দেখে তোমার নোলা সপসপিয়ে উঠল না?

—তুই কিছুই বুঝিস না। যার প্রতি অনুরাগ হয় তাকে

উদরসাৎ করা চলে না। মানুষটাকে যদি খেয়েই ফেলি তবে প্রেমের আর রইল কি? তার পর শোন।—মুদ্‌গল ঋষি বললেন, সুন্দরী, তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম, কাল মধ্যাহ্নে তোমার ওখানেই ভোজন করব।

পরদিন মুদ্‌গল এলে তাঁকে খুব খাওয়ালুম, নানা রকম ফল, মৃগমাংস আর পায়সান্ন। তাঁর ভোজন শেষ হলে বললুম, তপোধন, এক ঘটি এই মাধ্বীক পান করে দেখুন, অতি স্নিগ্ধ পানীয়, বনজাত পুষ্প থেকে মধুকর যে মধু আহরণ করে তাই দিয়ে আমি নিজে এই মাধ্বীক তৈরি করেছি। মুদ্‌গল বললেন, খেলে মত্ততা আসবে না তো? বললুম, না না, মাদক দ্রব্য কি আপনাকে দিতে পারি? খেলে মন প্রফুল্ল হবে, একটু পুলক আসবে। আপনি নির্ভয়ে পান করুন।

মুদ্‌গল চেখে চেখে সবটা খেলেন। বললেন, হুঁ, খুব ভালই তৈরি করেছ, বেশ ঝাঁজ। আর আছে? বললুম, আছে বইকি। মুদ্‌গল চোঁ চোঁ করে আর এক ঘটি খেলেন, তার পর আরও পাঁচ ঘটি। দেখলুম তাঁর চোখ বেশ ড্যাবডেবে হয়েছে, নাকের ডগায় গোলাপী রং ধরেছে, ঠোঁটে একটু বোকা-বোকা হাসি ফুটেছে, হাত একটু কাঁপছে। এইবারে এঁকে বলা যায়।

বললুম, মুনিবর, আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়েছি, আপনিই আমার প্রাণেশ্বর। আমাকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করুন।

মুদ্‌গল কিন্তু তখনও বাগে আসেন নি। বললেন, সুন্দরী, তোমার কুল শীল কিছুই জানি না, পাণিগ্রহণ করব কি করে? তা

ছাড়া শাস্ত্রে বলে, স্ত্রীজাতি স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নয়। তুমি অবলা নারী, পিতা মাতার অধীন, তাঁরাই তোমাকে পাত্রস্থ করবেন।

আমি বললুম, আমার পিতা মাতা না থাকারই মধ্যে, তাঁরা আমার খোঁজ নেন না। আমার আসল পরিচয় শুনুন, আমি হচ্ছি লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী।

চমকে উঠে ঋষি বললেন, অ্যাঁ, তুমিই শূর্পণখা? যতই রূপবতী হও রাক্ষসীকে আমি বিবাহ করতে পারি না। শুনেছি শূর্পণখা অতি ভয়ংকরী, নিশ্চয় তুমি মায়ারূপ ধারণ করে এসেছ।

আমি বললুম, ওহে মুদ্‌গল, রূপ তো নিতান্তই বাহ্য। আমি যদি মায়াবলে আমার বাহ্য রূপ বর্ধিত করি তাতে অন্যায়টা কি? তোমার ভয় নেই, এই মনোহর রূপেই আমি সর্বদা তোমাকে দর্শন দেব, কেবল রাত্রিতে শয়নকালে রূপসজ্জা বর্জন করব, নইলে আমার ঘুম হবে না। প্রদীপ নিবিয়ে অন্ধকারে আমি তোমার পাশে শোব।

—তোমাকে বিশ্বাস কি? যদি রাত্রিতে তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হয় তবে হয়তো আমাকে ভক্ষণ করে ফেলবে।

—ভয় নেই, যাকে তাকে আমি খাই না, আর পতি তো নিতান্ত অভক্ষ্য। শোন মুদ্‌গল, আমাকে বিবাহ করলে অতুল ঐশ্বর্য পাবে, দশানন রাবণ যাঁর ভয়ে ত্রিভুবন কম্পমান, মহাকায় মহাবল কুম্ভকর্ণ, আর সুবুদ্ধি ধর্মপ্রাণ বিভীষণ— এই তিন-জনকে শ্যালকরূপে পেয়ে ধন্য হবে।

মুদ্‌গল ঋষি দেখতে বোকার মতন হলেও অত্যন্ত একগুঁয়ে,

কিছুতেই বশে এলেন না। আমার রাগ হল, বললুম, আমাকে অবলা ললনা ঠাউরেছ, নয়? দেখ আমার বল।

মুদ্‌গলের দুই কাঁধে হাত দিয়ে চেপে বললুম, লাগছে?

—ছাড় ছাড়।

—এই এক মন চাপ দিলুম, লাগছে?

—উঃ, ছাড় ছাড়।

—এই দু মন চাপ দিলুম, বিয়ে করতে রাজী আছ?

—মুদ্‌গল যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন, মাধ্বীক যা খেয়েছিলেন মুখ দিয়ে সব হড়হড় করে গেল। আম নুম, এই তিন মন চাপ দিলুম, আর একটু দিলেই তোমার মেরুদণ্ড মচকে ভেঙে যাবে। বল, প্রাণেশ্বর হতে রাজী আছ?

আর্তনাদ করে মুদ্‌গল বললেন, আছি আছি।

—আকাশে দিবাকর, আমার চতুর্দিকে এই চেড়ীবৃন্দ, আর সম্মুখে ওই উচ্ছিষ্টলোভী কুকুর, সবাই সাক্ষী রইল, আবার বল, রাজী আছ?

—ওরে বাপ রে! আছি আছি। রাক্ষসী, তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী।

তখন হাত তুলে নিয়ে আমি বললুম, আজই রাত্রির প্রথম লগ্নে বিবাহ।

কাতর হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মুদ্‌গল বললেন, প্রিয়ে, একটি দিন অপেক্ষা কর, আমার গায়ের ব্যথা মরুক, পিঠ সোজা হক। কাল আমার গুরুদেব মহর্ষি কুলথ আসবেন, তাঁর অনুমতি আর

আশীর্বাদ নিয়ে তোমাকে পত্নীত্বে বরণ করব।

আমি বললুম বেশ, তাই হবে। কিন্তু খবরদার যদি সত্য-ভ্রষ্ট হও তবে আমার জঠরে যাবে, সেখান থেকে সোজা নরকে।

একদিন পরে মুদ্‌গলের আশ্রমে গিয়ে দেখলুম, তাঁর গুরু মহর্ষি কুলত্থ এসেছেন। আমি প্রণিপাত করলে তিনি প্রসন্ন হাস্য করে বললেন, রাক্ষসনন্দিনী, তোমাদের প্রণয়ব্যাপার শুনে আমি অতীব প্রীত হয়েছি। আশীর্বাদ করি, তোমাদের দাম্পত্যজীবন মধুময় হক। দেখি তোমার হাতখানা।

আমার কররেখা অনেকক্ষণ ধরে দেখে কুলত্থ বললেন হুঁ, ভালই দেখছি, তোমার ভাগ্যে অদ্বিতীয় রূপবান পতিলাভ আছে। তা আমার এই শিষ্যটি কিঞ্চিৎ খর্বকায় আর দুর্বল হলেও রূপবান বটে।

আমি বললুম, ভগবান, ওই রূপেই আমি তুষ্ট। আপনি শিষ্যের কররেখা দেখেছেন ?

মহর্ষি বললেন, দেখেছি বইকি। এক অদ্বিতীয়া সুন্দরীকে মুদ্‌গল পত্নীরূপে লাভ করবে।

হৃষ্ট হয়ে আমি বললুম, মহর্ষি, আপনার গণনা একেবারে নির্ভুল, রূপের জন্য আমি লঙ্কাশ্রী উপাধি পেয়েছি। সমগ্র জম্বুদ্বীপেও আমার তুল্য সুন্দরী পাবেন না।

কুলত্থ বললেন, তাই নাকি ? তবে তোমাকে আমি জম্বুশ্রী উপাধি দিলুম। কিন্তু রাক্ষসনন্দিনী, তোমার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা আছে। সম্প্রতি দশরথপুত্র রাম-লক্ষ্মণ বনবাসে এসেছেন,

নিকটেই পঞ্চবটীতে কুটীর নির্মাণ করে বাস করছেন। রামের ভার্যা জনকতনয়া সীতাও তাঁদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমার চাইতে একটু বেশী সুন্দরী।

আমি রেগে গিয়ে বললুম, আমার চাইতে সুন্দরী এই তল্লাটে কেউ থাকবে না, সীতাকে আমি ভক্ষণ করে ফেলব। তার কাছে নিয়ে চলুন আমাকে।

মহর্ষি বললেন, তোমার সংকল্প অতি সাধু। এস আমার সঙ্গে।

কুলথ আর মুদ্গলের সঙ্গে তখনই পঞ্চবটীতে গেলুম। একটু দূরে বনের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখলুম, কুটীরের দাওয়ায় বসে সীতা তরকারি কুটছে। পুরুষ জাতটাই অন্ধ, বলে কিনা আমার চাইতে সুন্দরী! বড়দা পর্যন্ত সীতার জন্যে খেপেছিলেন। তার পর দেখলুম, দূর্বাদলশ্যাম ধনুর্ধর এক যুবা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল, তার পিছনে আর একটি যুবা এক ঝুড়ি ফল মাথায় করে নিয়ে এল। বুঝলুম এরাই রাম-লক্ষ্মণ।

পুষ্কলা বললেন দেখেই তোমার মুণ্ডু ঘুরে গেল তো?

—ওঃ, কি রূপ, কি রূপ! মানুষ অত সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না। নিমেষের মধ্যে আমার মনোরথ বদলে গেল। কুলথকে বললুম, মহর্ষি, আমি ওই সীতাকে এখনই ভক্ষণ করছি, কিন্তু আপনার শিষ্য মুদ্গলকে আমার আর প্রয়োজন নেই, অদ্বিতীয় রূপবান ওই রামই আমার বিধিনির্দিষ্ট পতি, ওঁকেই আমি বরণ করব, ওঁর কাছে আপনার শিষ্য মর্কট মাত্র।

মহর্ষি বললেন, ছি রাক্ষসী, ও কথা বলতে নেই, তুমি যে বাগ্‌দত্তা।

উত্তর দিলুম, কথা আমি দিই নি, আপনার শিষ্যই দিয়েছিল, তাও স্বেচ্ছায় নয়, তিন মন চাপে কাবু হয়ে প্রাণেশ্বরী বলেছিল। ওকে আমি মুক্তি দিলুম। আমি এখনই রামের সঙ্গে মিলিত হব, আপনারা এখানে থেকে কি করবেন, চলে যান।

আমার কথা শেষ হতে না হতে মুদ্‌গলের হাত ধরে মহর্ষি কুলথ বেগে প্রস্থান করলেন।

শূর্পনখা অন্যমনস্ক হলেন দেখে পুষ্কলা বললেন, থামলে কেন পিসীমা, তার পর কি হল?

— ন্যাকামি করিস নি, কি হল তুই জানিস না নাকি?

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শূর্পনখা চিৎকার করে উঠলেন — ওরে রেমো সর্বনেশে, কি করলি রে! তার পর ছটফট করে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন, তাঁর কাঠের নাক-কান খসে পড়ল, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল, দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল, চোখ কপালে উঠল।

পুষ্কলা চেঁচিয়ে বললেন, এই চেড়ীরা, শিগ্‌গির আয়, পিসীমা ভিরমি গেছেন। মুখে জলের ছিটে দে, জোরে বাতাস কর, লংকা পুড়িয়ে নাকের ফুটোয় ধোঁয়া দে।